হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী

নেহরু বাল পুস্তকালয়

হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী

পদ্মিনী সেনগুপ্ত

অনুবাদ

অতসী দত্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচীপত্র

পরিচায়িকা	...	1
বংশ পরিচয়	...	5
প্রথম জীবন	...	8
শিক্ষাবিদ	...	12
পারিবারিক জীবন	...	15
রাজনীতি	...	21
রাজ্যপাল	...	26
লেখক ও বক্তা	...	32
কংগ্রেস ও জনগণ	...	40
মৃত্যু ও দান	...	52
আদর্শবাদী ও সংস্কারক	...	59

পরিচায়িকা

যীশুখৃষ্ট আর মহাত্মা গান্ধীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কখনো যদি কেউ আদর্শের সংগ্রাম করে থাকে তো তিনি—ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ইনি জীবনের শেষ বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত পরিয়ে দিয়েছিলেন গরীবকে, রোজগারের প্রতিটি পয়সা উৎসর্গ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা সৎ-সংস্থায়। তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় দেখা গেল, এই দানের অঙ্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক লক্ষে। তবু পাঁচ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হওয়ার আগে পর্য্যন্ত বছরের পর বছর তিনি পেতেন সামান্য স্কুল শিক্ষকের বেতন। ব্যক্তিগত জীবনে হরেনবাবু ছিলেন মিতব্যায়ী। বিলাসিতা বর্জন করে সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। এইভাবেই অর্থ সঞ্চয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তম দাতাদের তিনি হয়েছিলেন অন্যতম।

1951 থেকে 1956 সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত হরেন্দ্রকুমারকে থাকতে হয়েছিল রাজভবনে। বাকি জীবন তিনি কলকাতার এণ্টালীর ডিহি শ্রীরামপুরের পৈতৃক বাড়ীতেই থাকতেন। তাঁর চলার পথের দিশারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতই তিনি ছিলেন দেশের মাটিতে গড়া মানুষ—সরল, নির্ভীক আর শৃঙ্খলাপরায়ণ।

পায়ে বিদ্যাসাগরী চটী, পরণে ধুতি বা লুঙ্গী আর হাতা কাটা ফতুয়া। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব আর হাসি ঠাট্টা করে বেড়াচ্ছেন বা মিষ্টি বিতরণ করছেন—এমন একটি মানুষ ডিহি শ্রীরামপুরের বাসিন্দাদের কাছে খুবই পরিচিত। শিশুদের তিনি ভালবাসতেন, কারণ, সেখানেই খুঁজে পেতেন স্বর্গরাজ্য। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেও ভালবাসতেন। বলা হয়—একবার হরেনবাবু বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সবাই তাঁকে রাজ্যের রাজ্যপাল বলে চিনেও ফেলল। জিজ্ঞেস করতে লাগল বাসে চড়ার কারণ, তিনি উত্তর দিলেন : 'এই তো বেশ। কখনো কখনো এইভাবে বেড়াতে আমার বেশ লাগে।' এণ্টালীর

প্রতিবেশীরাই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী সাথী। এমনকি যখন রাজ্যপাল হলেন তখনও এদের সঙ্গে নিত্যকার যোগাযোগ রাখতেন, সাহায্যও করতেন।

তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই কাটত পড়াশোনা করে। অবশ্য, কখনো বা একান্তে হুঁকো টানতেন, আবার কখনো বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণ সব সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

তিনি হঠ্‌যোগের সমর্থক ছিলেন। এই নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করতেন—নিজে অভ্যাসও করতেন। খাদ্য আর পুষ্টি নিয়ে পড়াশোনা করতেন, নানারকম খাদ্যের প্রতিক্রিয়া নিজের ওপর পরীক্ষা করে দেখতেন। এই ব্যাপারে বিদেশীদের সঙ্গে তিনি চিঠিতে যোগাযোগ করতেন। নানা বিদেশী পত্রিকাও রাখতেন তিনি। শোনা যায়, একবার যখন অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, যোগ ব্যায়াম করে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিছু লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, হরেন্দ্রকুমার হঠযোগের বলে এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, অবশ্য এসবের সরাসরি কোন প্রমাণ নেই।

নানাদিক থেকে দেখলে তিনি ছিলেন এক অনুপম ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী। প্রথম জীবনে হরেনবাবু স্কুল শিক্ষক, পরে অধ্যাপক—তবুও কখনো এতটুকু শিক্ষাভিমানী ছিলেন না। ছাত্র হিসাবে হরেনবাবু, অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় শিক্ষকদের অনেক বেশী শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশও নিতেন। শিক্ষকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে রাজ্যপালের শপথ নেবার পরেই তিনি হাজির হলেন তাঁর বৃদ্ধ অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকারের বাড়ী। তাঁকে প্রণাম করলেন, চাইলেন আশীর্বাদ। 1951 সালে হরেন্দ্রকুমারের শিক্ষকদের মধ্যে তখন 87 বছরের স্যার যদুনাথই ছিলেন জীবিত। জাতীয় সভা সমিতিতে কোন মাননীয় অতিথি উপস্থিত থাকলে হরেনবাবু রাজ্যপালের নিয়মকানুন মানতে চাইতেন না। একবার স্যার যদুনাথ সরকার রাজভবনে আমন্ত্রিত হন। নিয়মানুসারে রাজ্যপালকেই মঞ্চ অবধি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। হরেনবাবু কিন্তু এই নিয়ম মানতে রাজী হলেন না। কর্মীদের বললেন 'আমার মাষ্টারমশাই এখানে রয়েছেন, তাঁকে পিছনে রেখে আমি কি করে এগিয়ে যাব?

তোমাদের নিয়মকানুন তোমাদেরই থাক, আমি যা ভাল বুঝব তাই করব।' তিনি তখন স্যার যদুনাথকে আগে যেতে অনুরোধ করলেন। শুধু তাই নয়, স্যার যদুনাথ আসন গ্রহণ করার পর তিনি বসলেন।[1]

পুরানো দিনের রীতিনীতির সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক সরলতার সমন্বয় ছিল। এইজন্যই হরেনবাবু জীবনে যে সব পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি আন্তরিকতা আর সততায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সময় সময় তাঁর সাধনা সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াত। কেউ কেউ বলত, তিনি কৃপণ, নীচমনাও। তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু বান্ধবরাও বলত: 'ও আর একটু উদার হতে পারতো, অন্ততঃ স্ত্রী বঙ্গবালার ওপর তো বটেই।' কিন্তু তাঁর সঞ্চিত অর্থে পরে অন্যরাই উপকৃত হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী, ছোটবেলা থেকেই খুব সাধারণ জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন। ওঁদের অসুবিধেও হ'তো না।

হরেন্দ্রকুমার বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে জোর দিতেন বেশী। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ধর্মীয় কুসংস্কার বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি। একবার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা, কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে এক বিশেষ রচনায়, তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কথা লিখেছিল।[2] তাঁর চরিত্রে কতকগুলি দুর্লভ গুণের সমন্বয় ছিল। তিনি একাধারে ছিলেন পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, মানব-প্রেমিক এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করেন। পরে লোকসভায় গিয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হরেনবাবু হয়ে উঠেছিলেন পরিপূর্ণ এক মুক্ত পুরুষ। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুপস্থিতিতে হরেন্দ্রকুমার তিন মাস গণ পরিষদে সভাপতির কার্য্যভার বহন করেন। এই সময়—মৌলিক অধিকার, নির্দেশক নীতি, ভাষা সমস্যা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়।

স্বয়ং হরেনবাবুই গণপরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সংখ্যালঘু উপ-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি। আর এই সমিতির নানা রকম কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। সংবিধানে সাধারণ বিধান হিসেবে সর্বজাতিধর্ম সমন্বয় ও সকল জাতির

---

1. মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার—নারায়ণ চৌধুরী
2. The Statesman, 3.11.51

কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য যে বিধি তা তৈরীর খসড়াতে তাঁর উদার মনোভাব ও পাণ্ডিত্য অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বিধান পরিষদ এবং সরকারী নিয়োগে ভারতীয় খৃষ্টানদের সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি বাতিল করে নেওয়ার ক্ষেত্রে হরেন্দ্রকুমারের এক বিরাট অবদান। পরে তিনি মুসলমান এবং শিখদেরও এই মতে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। গণপরিষদে বক্তৃতার সময় তিনি সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তারা সংবিধানে সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষের এক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

জীবদ্দশায় হরেন মুখার্জি আরো কতকগুলি কাজে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন—যেমন, মাদক দ্রব্য পরিবর্জন এবং এই সম্বন্ধীয় ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞাতে এবং কংগ্রেসের আদর্শ, মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা, উৎপাদন-শিল্প এবং কৃষিশিল্পে। ইনি এ সব আর অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে প্রচুর বই, প্রবন্ধ রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল থাকাকালীন হরেন্দ্রকুমার বাহ্যাড়ম্বর বা আত্মপ্রচার ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাতে তাঁর রাজ্যপালের মর্য্যাদা কখনো এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি, ধীর স্থির ভাবে নানা কর্ত্তব্য তিনি পালন করে গেছেন। নিরহংকার বন্ধু, রাজ্যের নেতা আর উপদেষ্টারূপে এই মানুষটি সকলের প্রিয় ছিলেন।

7 আগষ্ট, 1956 সালে ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির মৃত্যুতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন: ‘তিনি জনগণের এক মহান সেবক ছিলেন। এক আদর্শ পুরুষ এবং একজন খাঁটি খৃষ্টান ছিলেন তিনি। এই মানুষটি জীবনে কখনো অপ্রিয় কথা বলেন নি।’

বংশ পরিচয়

একবার বক্তৃতার সময় হরেনবাবু নিজের পূর্বপুরুষের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এক গোঁড়া পরিবারের সন্তান, কিংবা বলা যায় অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। একদিকে আমরা মা কালীর উপাসক—শাক্ত; আবার আর একদিক দিয়ে বৈষ্ণব, অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর এই মতে বিশ্বাসী। পারিবারিক ধারা অনুযায়ী আমার এক পূর্বপুরুষ শ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্য ছিলেন, শ্রীচৈতন্য দেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপেই আরাধনা করা হয়।' এই উক্তির মধ্যে কিন্তু কোন অহমিকা বা দম্ভের গন্ধ ছিল না। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের তিনি ছিলেন খৃষ্টান সন্তান।

3 জুন, 1952 সাল, দার্জিলিং-এ রাজ্যপালের কল্যাণ ও জনহিতকর তহবিলের অধিবেশন; পরণে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি, বিরাট জন-সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে আপন বংশ পরিচয় দিচ্ছিলেন তিনি। কারণ, তিনি জোরের সঙ্গে বলতে চাইছিলেন, সকল জাতিই সমান, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য তৈরী করে; এর সঙ্গে পূর্বপুরুষের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই। একজন নীচ কুলোদ্ভব লোকও ইচ্ছে করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

3 অক্টোবর, 1877 সালে হরেন্দ্রকুমারের জন্ম হয় (18 আশ্বিন 1284, বাংলা হিসাবে)। ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে হরেনবাবু পূর্বপুরুষের আদি নিবাসের গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁরা এসে আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বীরনগরে। শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য আর গোঁড়ামির জন্য তাঁদের পরিবার সুপরিচিত ছিল। তাঁর এক পূর্বপুরুষ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, একখানি টোল চালাতেন। আরেকজন পূর্বপুরুষ হলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ কৃত্তিবাস ওঝা। একজন জীবনীকার বলেন, 'এইরূপ এক ধার্মিক পরিবারে ধর্মান্তরকরণ

বেশ অদ্ভুত।'[1] কিন্তু আমরা যদি এক শতাব্দী পূর্বের বাংলার কথা ভাবি—রাজা রামমোহনের পরে বাঙালী সমাজের বিকাশ, বাঙালী যুব সমাজের ওপর হিন্দু কলেজের প্রভাব এবং ভারতের বুকে বড় বড় মিশনারী আর ইংরেজ পণ্ডিতদের পাশ্চাত্য ভাবধারার বিস্তার, তবে এই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে হরেন্দ্রকুমারের ঠাকুর্দা ভৈরবচন্দ্র যে কেন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রচলিত গল্প অনুসারে, ভৈরবচন্দ্র তাঁর গ্রাম ছেড়ে কলতায় ভাগ্যান্বেষণে আসেন। ইনিও সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, প্রগতিশীল কলকাতা নগরীতে নিজের প্রতিভা কাজে লাগাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে চাকরীর চেষ্টাও করতে থাকেন। শোনা যায়, ভৈরবচন্দ্র একদিন নিজের গ্রাম ছেড়ে পদব্রজে রওনা হন, দিনের শেষে এসে পৌঁছলেন শ্রীরামপুরে। সেই রাত্তিরে শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাছাকাছি একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু রাতের আঁধারে খানায় পড়ে গেলেন, প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাঁকে মিশনারীকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তখন স্বয়ং উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর সহকর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন আর ধর্মোপদেশ দিতেন। মিশনারীদের সেবাশুশ্রূষায় ভৈরবচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন। মিশনারীদের আন্তরিক সেবা যত্নে মুগ্ধ হয়ে বলতে গেলে স্বেচ্ছায় তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। কোন একজন জীবনীকারের মতে, 'মিশনারীদের দয়া আর আন্তরিক সেবা যত্নে ভৈরবচন্দ্র দারুণ অবিভূত হয়ে পড়েন। খৃষ্টানদের ধর্মানুরাগ, সর্বোপরি যীশুখৃষ্টের জীবন কাহিনী তাঁকে খৃষ্টধর্মের দীক্ষায় আকৃষ্ট করেছিল।'[2]

1952 সালের 19 জানুয়ারী শ্রীরামপুর কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় হরেন্দ্রকুমার মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'বিখ্যাত ভারতীয় তর্কশাস্ত্র বা আজকের ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। আমার মনে হয়, শ্রীরামপুর মিশনারীতে ইনিই প্রথম ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ সন্তান। এই ধর্মান্তরের ফলে তিনি তাঁর বিরাট পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এইসময় সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ

---

1. মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার
2. **Memorial Volume : Introduction by Pramathanath Banerjee**

পাণ্ডিত্য তাঁকে সাহিত্য রচনায় প্রচুর সাহায্য করে। . ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর, তাঁর বিধবা পত্নী, আমার ঠাকুমা, যা সামান্য ভাতা পেতেন, তাই দিয়েই আমার বাবাকে মানুষ করেন।'

ভৈরবচন্দ্র, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সঙ্গে করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। হরেন্দ্রকুমারের বাবা লালচাঁদের তখনও জন্ম হয়নি। ইনি পাঁচ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর জন্ম খৃষ্টান পরিবারেই। 1813 সালে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুকালে লালচাঁদের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর।

প্রথম জীবন

লালচাঁদেরা খুবই গরীব ছিলেন। তাঁর বিধবা মা শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাছ থেকে যা সামান্য ভাতা পেতেন, তাই দিয়েই লালচাঁদকে মানুষ করেন। কিন্তু মা হঠাৎ মারা যাওয়াতে, পড়াশোনার জন্য লালচাঁদকে পুরোপুরি মিশনারীদের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলো। উঁচু ক্লাশের পড়া শেষ হ'লে তিনি নিজস্ব প্রতিভাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে থাকলেন এবং চাকরীর চেষ্টাও করে চললেন। তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল, তাই তিনি কলকাতায় ভারত সরকারের দপ্তরখানায় অর্থনৈতিক বিভাগে নথি রক্ষণের কাজে নিযুক্ত হ'লেন। অচিরেই তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ফলে, তিনি মন্ত্রী পরিষদের প্রধান নথি রক্ষকের পদটি পেয়ে গেলেন। তারপর তাঁকে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠান হোল। বছরে সাত মাস দপ্তর সিমলায় ভাইসরয়ের সঙ্গে চলে যেত। তাই, বছরে সাত মাস শীতের সিমলায় এবং বাকী পাঁচ মাস সমতলের কলকাতায় তাঁকে কাটাতে হ'ত। 1885 সালে সাতান্ন বছর বয়সে চোখে কম দেখার জন্য তাঁকে কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। সে সময় তাঁর বেতন ছিল 100 টাকা। তখনকার দিনে এটা বেশ ভালো অর্থ বলা যায়।

প্রথমে লালচাঁদ হাওড়ায় থাকতেন—পরে শেয়ালদার কাছে 22 নং বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেনে উঠে আসেন। হরেন্দ্রকুমার এখানেই জন্মেছিলেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লালচাঁদ এন্টালীর ডিহি শ্রীরামপুরে বাড়ী তৈরী করেন। ভবিষ্যতে এই বাড়ীটিই তাঁদের স্থাবর সম্পত্তি হয়। লালচাঁদ আজীবন ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। স্ত্রী প্রসন্নময়ীকেও একটা ছোট্ট জমি দিয়েছিলেন। 1896 সালে আটষট্টি বছর বয়সে লালচাঁদের পত্নীবিয়োগ হয়। হরেনবাবু তখন উনিশ বছরের ছেলে। বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। এর বহু বছর পরে, গণপরিষদে একবার ভাষণ দিতে গিয়ে মায়ের বিষয়ে

বলেছিলেন : ছোটবেলা থেকেই মা আমায় পরিষ্কারই বুঝিয়ে দেন—জীবনে আমায় দুটি কর্তব্য পালন করতে হবে। আর সেই থেকেই তা আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এক, যতদিন প্রাণ থাকে আমায় মদ আর মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর দ্বিতীয়টি হ'ল, সাম্প্রদায়িকতার শেষ দেখে যেতে হবে। প্রসন্নময়ী হরেনবাবুকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন : জীবনে যদি কখনো জনসম্পর্কে বা রাজনীতিতে তিনি আসেন, তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য দুটি পালনে তাঁকে আন্তরিক চেষ্টা চালাতে হবে।

লালচাঁদের এন্টালীর বাড়ী এমন পাড়ায়, যেখানে মুসলমান আর খৃষ্টানের বসতি বেশী। তারা বেশীর ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত। এই পাড়াটা তখনই বেশ ঘিঞ্জি ছিল, তাছাড়া ঠিকমত গড়েও ওঠেনি। ছোট থেকেই হরেনবাবু রামায়ণ আর মহাভারত মেনে চলতেন। নিজে খৃষ্টান বলে বাইবেলের ওপর তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি মনে করতেন, সব ধর্মগ্রন্থই সেই এক চিরন্তন সত্যের কথা বলে—মানবপ্রেম, ক্ষমা আর অহিংসা। সেন্ট পল্‌সের জীবপ্রেমের উপলব্ধি—'যতই আমি মানুষের বা দেবদূতের মত কথা বলি না কেন, দান ছাড়া আমার কথা পেতলের করতালের ঝনঝন আওয়াজ তোলার সামিল।'—এরই ভিত্তিতে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছিলেন।

পৈতৃক বাড়ীতেই হরেনবাবুর ছোটবেলাটা সাধারণ, শান্ত পরিবেশে কাটে। 1885 সালে তিনি কলকাতার রিপন কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। মাত্র কয়েক বছর আগেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছেলেদের বৃটিশ সরকারের প্রতি কোনরূপ রাজ-আনুগত্য শেখান হোত না। লালচাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ধারা বা সভ্যতার কোন নাম গন্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন পুরদস্তুর বাঙালী। হরেনবাবুও নিজের দেশের মাটির সঙ্গে অভিন্নতা বজায় রেখেছিলেন। সব সময় পরতেন ভারতীয় কাপড়ে তৈরি পোষাক। বি. এ. পাশ করার পর রিপন কলেজ থেকে তিনি চলে আসেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। পরে কলেজ পত্রিকায় তিনি এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে লেখেন—'প্রথমদিকে আমি কলেজে মুখচোরা আর লাজুক ছাত্র ছিলুম। অন্যান্যদের মতো মাষ্টার মশাইদের কাছাকাছিও আসতে পারতুম না।' অথচ তাঁর চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের বিশেষ

ভূমিকা ছিল। এই জন্যেই সারা জীবনই তিনি শিক্ষকদের গভীর শ্রদ্ধা করতেন। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদ পাওয়া সত্ত্বেও হরেনবাবু শিক্ষকদের খুঁজে বের করতেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেন।

লালচাঁদের ইচ্ছে ছিল, তাঁর ছোট ছেলেটি গির্জার সেবায় নিযুক্ত হোক। হরেন্দ্রকুমার কিন্তু রাজী হন নি। পরে তিনি বলেছেন: 'আপাত দৃষ্টিতে জীবনের এই বিরাট সুযোগ ছেড়ে দিয়ে আমি ঠিকই করেছিলুম বলে আমার মনে হয়। শুধু শুধু কেন আমি গরীবিয়ানা মানতে যাব? আর তাছাড়া গির্জার পাদ্রী হওয়ার মধ্যে কোন মানেই নেই।'

তখনকার দিনে ঠিকমত বাস-ট্রামের সুবিধে ছিল না। হরেনবাবু রোজ হেঁটেই স্কুল যেতেন। হরেন্দ্রকুমার এম. এ.-তে প্রথম হ'য়েছিলেন—এ খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কেননা, কোনদিনই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। সাধারণ ছেলের মতোই খেলাধূলো আর পড়াশোনা করতেন তিনি। বাস্কেট বল খেলায় তাঁর ঝোঁক ছিল। খেলাধূলো করে তার অবশ্য ভালই হ'য়েছিল। সারা জীবন তিনি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের মানুষ হ'য়ে উঠেছিলেন।

1893 সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করে, তাঁর স্কুল জীবনের শেষ হয়। তারপর দু'বছরে এফ. এ. পড়ে 1897 সালে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন। বি. এ.-তে তাঁর ইংরেজী অনার্স নিয়ে পাশ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে কোন রকমে পরীক্ষায় বসেন। এ পর্য্যন্ত কিন্তু মনে হয় না, এই মানুষটি বড় হ'য়ে একদিন মস্ত বড় শিক্ষাবিদ হবেন। রিপন কলেজিয়েট স্কুলে থাকতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংস্পর্শে গভীরভাবে তিনি প্রভাবিত হন। সুরেন্দ্রনাথ নিজের কলেজের ছেলেদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে নানা শিক্ষা দিতেন। শুধু তাই নয়, এই স্বদেশপ্রেমী মানুষটি ছেলেদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে নিজেও সংগ্রামে নামতেন। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ রাজ্যপালের দেশভক্তি এখানেই অঙ্কুরিত হয়। তখন থেকেই তিনি পড়ার বই ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের বই পড়তে আরম্ভ করেন। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তিনি বই কিনতেন। সেক্সপীয়র, মিল্টন, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে আরও সব বড় বড় লেখকদের প্রতি হরেনবাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এইসব বই পড়তে গিয়ে নিজের

পড়াশোনা অবহেলিত হোত। পরে কিন্তু এই ইংরেজী উপন্যাস নিয়েই হরেনবাবু তাঁর পি. এইচ. ডি'র জন্য গবেষণা করেন।

হরেন্দ্রকুমার এম. এ. পড়তে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার ও এইচ্. এম. পারসিভালের মতো মানুষ। হরেনবাবুর ওপর পারসিভাল সাহেবের বিশেষ নজর ছিল। তিনি নানারকম সাহায্যও করতেন। যদুনাথ সরকার তখন ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিকও। 1955 সালের 15 জুন প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী পালিত হয়। হরেনবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন: 'এই বিরাট শিক্ষায়তনের (তখনকার দিনের) সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর এখানকার নির্মল খেলাধূলোর দিনগুলো রোমন্থন করলে, এখনও আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। এখানকার মহান শিক্ষাব্রতীদের সংস্পর্শে এসে আমার জীবন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সেই 1898-এ কলেজ ছেড়েছি। কিন্তু আজও আমার জীবন, চরিত্র তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত। এই সুযোগে আজ আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বলা হয়, হরেনবাবু একদিন কলেজ স্কোয়ারে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে খবর দিল, এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তিনি। এই সাফল্যে শুধু যে হরেনবাবু নিজেই অবাক হয়েছিলেন তা নয়, তাঁর শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব সবাই আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদকটি নিঃসন্দেহে তার মতো যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।

শিক্ষাবিদ

পড়াশোনা শেষ করেই হরেনবাবু হলেন স্কুল শিক্ষক। এই মানুষটি যেন শিক্ষক হয়েই জন্মেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হবার পরেও নিজেকে তিনি 'স্কুলমাষ্টার' বলেই মনে করতেন। এম. এ. পাশ করার পর সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠাবার প্রস্তাব করে। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পারসিভাল হরেন্দ্রকুমারকে বর্মা কলেজে একটি কাজের জন্য বলেছিলেন। হরেনবাবু কিন্তু এ প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করেন, পরিবর্তে তিনি পারসিভাল সাহেবকে কলকাতাতেই একটা কাজ যোগাড় করে দিতে অনুরোধ করেন। এই কথায় পারসিভাল তো অবাক! এই ঘটনাটি হরেনবাবু বিশদভাবে বলেছেন—'সেদিনটার কথা আমি কখনও ভুলব না। একদিন অধ্যাপক পারসিভালের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম। লিখেছেন, সরকার সম্প্রতি রেঙ্গুণে একটি কলেজ খুলেছেন, আর সেই কলেজে ইংরেজী পড়াবার জন্য তারা পারসিভালকে একজন লোক মনোনয়ন করে দিতে বলেছেন। এই পদের বেতন শুরুতে মাসে ৫০০ টাকা এবং পরে ৭০০ টাকা পর্য্যন্ত। আমি বলেছিলুম, বাবাকে জিজ্ঞেস না করে আমি এই পদ গ্রহণ করতে পারি না। আজ আর আমার বাবা বেঁচে নেই। পারসিভাল শেষে আমাকে এও বললেন, আমি নাকি 'স্কুল মাষ্টারি' করে সময় নষ্ট করছি।' অধ্যাপক পারসিভাল এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, হরেনবাবুকে তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে স্কুল মাষ্টারটি ব'ললেন, 'আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তিনি জ্বলে উঠলেন। তারপর তাড়া করলেন যতক্ষণ না আমি ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে বাড়ির কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গেটের বাইরে বের হয়ে না গেছি। তিনি ফটকে দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ না আমি আরো দূরে গেছি।'

অচিরেই কিন্তু অধ্যাপক পারসিভাল হরেনবাবুকে ক্ষমা করেছিলেন।

এবং পরে হরেন্দ্রকুমারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত করার জন্য সুপরিশ করেছিলেন।

হরেনবাবুর সঙ্গে চিন্ময়ী দেবীর বিয়ে হয় 1898 সালে শ্রীরামপুরের গির্জায়—তাঁর বাবা এখানেই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন। চিন্ময়ী গোস্বামী হরেনবাবুর প্রথমা স্ত্রী। এখান থেকেই তাঁর 'স্কুল মাষ্টারে'র জীবন শুরু হয়। কিন্তু স্কুল শিক্ষকের বেতন তখন খুবই অল্প ছিল। তাই তিনি আয় বাড়াবার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছেলে পড়াতে লাগলেন। তবু তো মাথা গোঁজবার জন্য ডিহি শ্রীরামপুরের ছোট বাড়ীটি ছিল। 1940 অবধি, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই মানুষটি শিক্ষকতা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ থেকেই হরেনবাবু অবসর গ্রহণ করেন।

1898 সালে হরেনবাবু সিটি কলেজে যোগ দেন। এক বছর পরে মাসিক 75 টাকা বেতনে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে কাজ নিয়ে চলে যান। তবে বুড়ো বাবাকে দেখতে প্রায়ই তিনি কলকাতায় আসতেন। পরে আবার সিটি কলেজেই ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে চলে আসেন 100 টাকা বেতনে। 1913 পর্য্যন্ত, দীর্ঘ চোদ্দ বছর এখানে তিনি অধ্যাপনা করেন। এরপর স্যার আশুতোষ মুখার্জির ইচ্ছানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরেজী সাহিত্যের সহ-অধ্যাপক পদে। এখানে তিনি মাসে 150 টাকা বেতন পেতেন। স্যার আশুতোষ এই তরুণ শিক্ষকটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের দু'টি ছেলে রমাপ্রসাদ আর শ্যামাপ্রসাদের গৃহশিক্ষক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন। বুড়ো বয়স অবধি এই ছাত্র দু'টির সঙ্গে হরেনবাবুর যোগাযোগ ছিল।

হরেন্দ্রকুমারের পরবর্ত্তী পদক্ষেপ—স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের সম্পাদকের পদ এবং সেই সঙ্গেই 'কলেজ পরিদর্শক' হিসেবে নিযুক্ত হওয়া। একটানা সতের বছর এই আসন দু'টি তিনি অলঙ্কৃত করে থাকেন। এই সময় তাঁকে বাঙলা আর আসাম এলাকায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়। বর্ত্তমানে এই এলাকাগুলি বিহার, ত্রিপুরা আর মনিপুরের অন্তর্গত।

নিষ্ঠাবান কর্মীর স্বীকৃতি স্বরূপ হরেনবাবু ইংরেজী বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। এবং সাত বছর এই পদে কাজ করেন। 1941 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হয়েছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের

'বোর্ড অফ স্টাডিস্ এণ্ড ফ্যাকালটি অফ আর্টস' বিভাগের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার দায়িত্ব নিলে হরেনবাবু তাঁর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতে তাঁর সাহিত্যচর্চার সুযোগ আরো বেড়ে যায়। পর বর্ত্তীকালে হরেন্দ্রকুমারকে ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ভাষা সংঘের (মডার্ণ ল্যাংগুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইংল্যাণ্ড এণ্ড আমেরিকা) অবৈতনিক সভ্য করা হয়।

1819 সালে হরেন্দ্রকুমার ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস (গবেষণামূলক প্রবন্ধ) জমা দেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিই প্রথম ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে কাজ কর্ম শুরু করেন। হরেনবাবুর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল—ইংরেজী উপন্যাস।

শিক্ষকতা করতে করতেই এই মানুষটি গরীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশবন্ধুর তত্ত্বাবধানে তখন মুক্তি আন্দোলন চলছিল। হরেনবাবু এই আন্দোলনে ভাগ নেন। তিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। বাঙালী চাষীদের দুঃখ দুর্দশা অন্তরে উপলব্ধি করতে থাকেন। এইজন্যেই এই বিষয় নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে তিনি আগ্রহী হয়ে পড়েন। বস্তুত, বিধানসভায় প্রথম ভাষণে তিনি মাধ্যমিক স্তরে কৃষি-শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির দুই ধারার কাজ আছে। এই কাজ দু'টি যথাযথ পালন করতে পারলে দেশের প্রভূত উপকার হবে। প্রথমত, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার। একবার তা ঠিকমত করতে পারলে গ্রামবাসীদের উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালী শেখাতে পারা যাবে। গ্রামীণ এলাকায় এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' এই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজবিজ্ঞান আর ইতিহাস নিয়ে হরেন-বাবু একাধিক বই লিখতে শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে হরেনবাবু কখনো শিক্ষার জগত থেকে সরে যান নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হবার পর, পদাধিকার বলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য হন। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করার তিনি প্রচুর সুযোগ পান। শুধুমাত্র অকৃপণ দান দিয়েই তিনি এর উন্নতি করেন নি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

পারিবারিক জীবন

হরেনবাবু ছিলেন বরাবর একজন স্নেহশীল পিতা এবং আদর্শ স্বামী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই মানুষটি জীবনের শুরুতেই স্ত্রী চিন্ময়ী দেবী এবং পুত্রকে হারিয়েছিলেন। মাত্র 24 বছর বয়সে চিন্ময়ী দেবীর সঙ্গে হরেনবাবুর বিয়ে হয়। চিন্ময়ী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। স্বভাবটিও বড় শান্ত ছিল। জীবন দিয়ে শ্বশুর আর স্বামীর সেবা করেন। এঁদের বিবাহিত জীবনের মেয়াদ মাত্র কুড়ি বছর। 1904 সালে এঁরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। নাম রাখেন, সুধীরকুমার। এঁরা মিলে একখানি শান্তির নীড় রচনা করেছিলেন। সাদামাটা জীবন, বাঁচার জন্য ন্যূনতম চাহিদা—তাছাড়া, একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষকের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করার সামর্থ্যই বা কোথায়? হিন্দুধর্মানুসারে জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায় হোল—গার্হস্থ্য। হরেনবাবু গার্হস্থ্য জীবনের সকল রীতিনীতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ সংসার গড়ে তোলেন। কঠোর পরিশ্রমের চাপে সংসারকে তিনি এতটুকু অবহেলা করেননি।

কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর বাদে এক মর্মান্তিক আঘাতে হরেনবাবুর সংসারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

হরেনবাবুর ছেলে সুধীরকুমার প্রথমে সেন্ট পলস্ স্কুল, পরে সিটি কলেজে পড়াশোনা করে। 1921 সাল। সুধীরকুমার নিদারুণ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হোল। তখন তার মাত্র সতের বছর বয়স। যথাসাধ্য চিকিৎসা করেও তাকে সারিয়ে তোলা গেল না। এ্যন্টি-বায়োটিক তখনও অজানা ছিল। সেই কারণেই এই ভীষণ রোগ সুধীরকুমারের জীবনদীপ নিভিয়ে দিল। হরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী চিন্ময়ী দেবী এই মর্মান্তিক আঘাত সয়ে নেওয়া সত্ত্বেও কয়েক মাস পরে মারা যান। হরেনবাবু হঠাৎ একেবারে একা হয়ে পড়লেন। সারা বাড়ীতে তখন মাত্র দুটি প্রাণী—একজন কঠিন পরিশ্রমী 'স্কুল মাষ্টার' আর অন্য-জন, তাঁরই বৃদ্ধ পিতা। এখন হরেনবাবুর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—

ধর্মগ্রন্থ। তবে এই মর্মান্তিক আঘাতের কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। নিয়মমাফিক কাজকর্ম আর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা চলতেই থাকে। কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনায় একটা হয়তো ভাল ফলও হয়েছিল। হরেনবাবু উপলব্ধি করেন, গোড়া থেকেই ছেলেদের যত্ন নেওয়া উচিত। আরো বেশী উৎসাহ দেওয়া উচিত। তখনকার দিনে সাধারণতঃ ছেলেরা যতখানি উৎসাহ, যতখানি যত্ন পেত, হরেনবাবুর মতে তাদের জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের উন্নতি সাধনে সর্বতোভাবে যতখানি করা সম্ভব, তা তিনি করবেন বলে মনোস্থির করলেন। সম্ভবতঃ এই মনোভাবই তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করায় অনুপ্রাণিত করে। বহু কষ্টের উপার্জন দান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাতে ছাত্ররা বৃত্তি পায়। এই উদ্দেশ্য সফল করতে নিজে সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে টাকা বাঁচাতে লাগলেন। ক্রমে এই সঞ্চিত অর্থ নিজের দেশের মানুষের উন্নতি সাধনে উৎসর্গ করেন।

চিন্ময়ী দেবী মারা যাওয়ার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরেনবাবুকে বিয়ে করতে হয়। শুধু বাবাকে খুসী করতে। বুড়ো বাবার কেবলই মনে হচ্ছিল, বাড়ীতে একটা বৌ-এর বিশেষ প্রয়োজন।

তখনকার দিনে বঙ্গবালা একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগে কাজ করতেন। হরেনবাবুর বাবা লালচাঁদের চোখ পড়ে এঁনারই ওপর। অতএব, 1923 সালে হরেনবাবু আর বঙ্গবালা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'লেন। এঁদের কোন সন্তান হয়নি। 1927 সালে 99 বছর বয়সে লালচাঁদ মারা যান।

দৈনন্দিন জীবনে হরেন্দ্রকুমার সরল ভারতীয় জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি রাজভবনেও তিনি এই ভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। এই মানুষটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল, সরল আর অনাড়ম্বর। রাজভবনে, রাজ্যপালের সংসারেও আমরা এরই প্রতিচ্ছবি দেখি। নিজেদের পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে এঁরা এতটুকু সচেতন ছিলেন না। কেউ বুঝতেই পারতো না—এঁরা এই রাজ্যের রীতিমত গণ্যমান্য নাগরিক। হরেনবাবু রাজ্যপালের উচ্চপদমর্য্যাদা সহজ এবং বিনীতভাবেই গ্রহণ করেন। এইভাবেই তাঁরা জনগণের সামনে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরেন। বঙ্গবালা যদিও সব সময় বিশিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর মতই আচরণ

করতে চেষ্টা করতেন। তবে, নিয়মমাফিক সভা সমিতি আর রাজনৈতিক আদব কায়দার একঘেঁয়েমি সময় সময় এই শান্ত প্রকৃতির মহিলাটিকেও ক্লান্ত করে তুলতো। হরেন্দ্রকুমার কিন্তু শান্ত সংযতভাবে মর্য্যাদার সঙ্গে রাজ্যপালের কর্তব্য পালন করে যেতেন। একদিক দিয়ে বলা যায়, রাজ্যপালের জটিল কাজগুলো, ইনি বেশ উপভোগই করতেন।

রাজভবনে সেই নৈশভোজের দিনটি আজও আমার মনে আছে। গৃহস্বামীরা দু'জন ছাড়া, আমরা আর চারজন। বঙ্গবালার পরণে একখানা সাধারণ তাঁতের শাড়ী। সেটা শীতকাল। কাজেই গায়ে একটা পুরনো, চারিদিকে রিপু করা কার্ডিগান। আগে থেকে যদিও আমরা জানতাম, এ এক ঘরোয়া সান্ধ্যমিলন, জাঁক-জমকের প্রশ্নই থাকবে না, তবুও সত্যি বলতে কি, এতটা আশা করিনি। বাড়ীর মতই টেবিলে খাবার রাখা। পুরোপুরি বাঙালী খাওয়া, তবে বেশ ভাল। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হোল, বঙ্গবালা সেদিন যা গয়নাগাঁটি আর কাপড় পরেছিলেন, তার চেয়ে বোধহয় আরেকটু ভাল পরার ইচ্ছে ছিল। আমি একটা কাঞ্জিভরম পরেছিলুম। বঙ্গবালা হঠাৎ শাড়ীটার দাম জিজ্ঞেস করে বসলেন। টেবিলের আরেক প্রান্তে বসেছিলেন তাঁর স্বামী। দামটা শুনেই স্বামীকে অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন, তিনি কিন্তু এইরকম দামী শাড়ী কখনো উপহার পাননি। তারপর বসবার ঘরে কফি খাওয়ার সময় বঙ্গবালা আবার প্রশ্ন করে বসলেন, আমার কানপাশাটা আসল হীরের কিনা! এই রকম দামী রত্ন তাকে না দেওয়ার জন্য তিনি আবারও স্বামীর কাছে অভিযোগ করলেন। এমনিতে আমি গয়নাগাঁটি বিশেষ যে পছন্দ করি তা নয়। কিন্তু রাজভবনে নিমন্ত্রণ বলে, মায়ের দেওয়া হীরের কানপাশাটি পরেছিলাম। বঙ্গবালার কথায় নিজেকে যেন কেমন অপব্যয়ী মনে হোতে লাগলো। অবশ্য, সেই সঙ্গে আমার এও মনে হোল, বঙ্গবালা বোধহয় নিজের কাপড় চোপড়, গয়নাগাঁটির জন্যে বেশি খরচা করতেই চান। তাই আমি ওঁনার কয়েকজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি—এতটা সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য বঙ্গবালা কি কখনো অনুতাপ করেছেন? আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, ইচ্ছাকৃতভাবেই বঙ্গবালা এই পথ বেছে নেন। কারণ, স্বভাবতই মিতব্যয়ী ছিলেন

তিনি। ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে কোন বিলাসিতার চিহ্নমাত্র ছিলনা। এমনকি জীবনের ন্যূনতম বিলাসও এঁরা কোনদিনও চাননি। রাজভবনে যাবার আগে পর্য্যন্ত এঁরা দু'জনে ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতেই থাকতেন। একবার হরেনবাবু বাড়ীর ওপরতলায় জলের জন্য পাকা কলের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবালা কিন্তু বারণ করেন। নীচের কল থেকে বালতি ভ'রে জল তোলাই শ্রেয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

রাজ্যপালের মৃত্যুর পরে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তিনি নিতান্ত সহজ সরল জীবন-যাপনের আদর্শের জন্য মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে নিঃসহায় করে রেখে গেছেন। এই অভিযোগ খাঁটি নয়। বঙ্গবালা স্বেচ্ছাতেই এই সরল জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন, আর সম্ভবত এজন্য তাঁরা দু'জনে মিলেমিশেই কাজ করেছেন, যে কাজ এখন—'সরল জীবন-যাপন করো, যাতে অন্যরাও সরলভাবে বাঁচতে পারে'—এই শ্লোগানে রূপান্তরিত হ'য়েছে। হরেন্দ্রকুমারের উইলে বঙ্গবালা যে জীবন বেছে নিয়েছিলেন সেই জীবন স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। বিধবা হওয়ার পর তাঁর আর্থিক দৈন্য, অনেকের মতে, ঘটেছিল কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে। যাঁরা সেই সময় তাঁর চারপাশে এসে ভীড় করেছিল এবং তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়েছিল।

কিছু কিছু ব্যাপারে বঙ্গবালা বেশ খামখেয়ালী ছিলেন। যেমন, বিভিন্ন পার্টিতে তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত সব খামখেয়ালী কথাবার্ত্তায় অতিথিরা বিস্মিত হয়ে যেতেন। একবার এক ইংরেজ দম্পতি তাঁদের বাড়ীতে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হন। বঙ্গবালা ফস্ করে এখানেও এক মন্তব্য করে বসেছিলেন। ভোজের শেষে কফি পরিবেষনের পর বঙ্গবালা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'আমার কর্তব্য তো শেষ, এবার আমি যাই।' যতদূর আমি জানি, হরেনবাবু কখনো তাঁর স্ত্রীকে শুধরোবার চেষ্টা করেন নি বা তাঁর মধ্যে রাজ্যপালের স্ত্রীর ভাবমূর্ত্তিও গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। দেখে মনে হোত, বঙ্গবালাকে নিজের মত জীবন-যাপন করতে দিয়ে হরেনবাবু খুশীই ছিলেন। তিনি নিজে কিন্তু রাজ্যপালের মর্য্যাদার সঙ্গেই জনগণের সেবা করেই জীবন কাটাতেন। ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্গবালা স্বামীর ভাবধারা ও আদর্শেরই অংশীদার ছিলেন। এইজন্য সবাই তাঁকে ভালবাসতো, প্রশংসাও

করতো। সাধারণভাবে এই মহিলাটি প্রায় সীতার ভাবমূর্ত্তি গ'ড়ে তোলেন।

হরেন্দ্রকুমার বাংলা আর ইংরেজী সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। তোরো, রাসকিন, টলষ্টয়, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্র-নাথকে ভিত্তি করেই তাঁর জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। ভগবান আর খৃষ্টধর্মে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে সব ধর্মই সত্যকে প্রচার করে। তিনি তাই দার্জিলিং-এর পাহাড়ীদের মধ্যে রামায়ণ আর মহাভারত জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষ আগ্রহী হন। হরেনবাবু ঠিক রীতিসম্মত খৃষ্টান বা পাদ্রি ছিলেন না। নিজে যদিও বাপটিস্ট খৃষ্টান ছিলেন, আন্তরিক সততা আর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েই তিনি যীশুখৃষ্টকে শ্রদ্ধাভরে উপাসনা করতেন।

হরেনবাবুর জীবনে মহাত্মা গান্ধী আর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে শিখেছিলেন—সমবেদনা। অপর দিকে গান্ধীজী শেখান—সরলতা আর মাটীর মানুষের কাছাকাছি থাকতে। তিনি কায়েমী স্বার্থ সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়ে জনগণেরই একজন হ'তে শেখেন। বলতে গেলে, হরেনবাবুই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সংস্কারমুক্ত পুরুষ। তাঁর সময় শিক্ষক, কৃষক আর জোতদারদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে উঠেছিল রাজভবন। এতে কিন্তু হরেনবাবুর পদমর্য্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। একজন বিশিষ্ট নাগরিক কেমন করে সাধারণের সঙ্গে মিশতে পারে তা তিনি জগৎকে শিখিয়েছেন। রাজ্যপাল থাকাকালীন নানা কাজের মধ্যে তিনি একটি বিষয়ে বিশেষ নজর দেন—বৃহৎ যক্ষা পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনা। এই যক্ষা কেন্দ্রের যে কোন একটি বাড়ী আমার ভগ্নীপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর নামে করতে বলার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর কাছে দু'একবার যাই। অচিরেই আমি ঐ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি। এই কেন্দ্র গড়ে ওঠার আগেই হরেনবাবু ইহজগত ছেড়ে চলে যান।

সাধারণতঃ হরেনবাবু বাড়ীতে ধুতি বা লুঙ্গী আর ফতুয়া পরে থাকতেন। শোনা যায়, এত সাধারণ জামা কাপড়ের জন্য দারোয়ান, চাকররা সময় সময় রাজ্যপালকে নিজেদেরই একজন বলে ভুল করতো। একজন কাহিনীকারের অনুমান, এই নিয়ে লোকজনেরা

নিশ্চয় আড়ালে হাসাহাসি করতো। অনেক সময় এমনও হোত—কেউ হয়তো ওঁকে ঠিকমত বুঝতে বা চিনতে না পেরে খাতির করল না। তিনি কিন্তু এতে এতটুকু রাগ করতেন না, উল্টে বেশ কৌতুকবোধ করতেন।

অর্থ শুধুমাত্র নিজের জন্য জমানো উচিত নয়, হরেনবাবু একথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন। মুক্তহস্তে জনগণকে দান করা মানুষের কর্তব্য। এমনকি নিজের উপার্জনও কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'তে পারে না। সমগ্র জাতির উন্নতিতে তা উৎসর্গ করা উচিত। ধনীরা আপন অর্থে আপনি যেন রুদ্ধ না হন। গান্ধীজীর মতো হরেনবাবুও তৃতীয় শ্রেণীতে করে ঘুরতে ভালবাসতেন। কিন্তু জনগণের চাপে তিনি মধ্যশ্রেণীতে (ইণ্টারমিডিয়েট) চড়তে রাজী হন। হরেনবাবু খুব কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসি ঠাট্টা করতেন। অহমিকা বা অহংকার এই মানুষটিকে স্পর্শ করতে পারে নি।

রাজনীতি

হরেন্দ্রকুমারের রাজনীতি হিংসা ও পক্ষপাত শূণ্য ছিল। তিনি ছিলেন খাঁটী গান্ধীবাদী, মানবদরদী আর সদাশয় মানুষ। 1937 সালে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। 1935 সালে ভারত সরকার আইন অনুযায়ী বাংলার বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হন। তখন তিনি শিক্ষকতা করতেন। হরেনবাবু ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধিত্ব করেন। 1947 সালে বাংলা বিধানসভা ভেঙ্গে যায়। হরেনবাবু শেষ অবধি এই সভার সভ্য ছিলেন। এরপর তিনি বিধান পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাঙলাদেশে তখন সাম্প্রদায়িকতার ঝড় বয়ে চলছিল। হরেন্দ্রকুমার বিধানসভায় বার বার এর বিরুদ্ধে বলেন। এই মানুষটি মদ, মাদক দ্রব্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রাম করেন। ন্যায়ের জন্য তিনি কখনও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি। 1937 সালে 4 সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক বাজেটে 'প্রাদেশিক শুল্ক' বাবদ খরচের ব্যাপারে একটি মুলতুবী প্রস্তাব আসে। হরেন্দ্রকুমার এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সেইসময় সরকারের ধারণা ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন করলে সরকারের পক্ষে বাজেটের খরচা চালানো অসম্ভব। হরেনবাবু কিন্তু একথা মানতে রাজী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বাইবেল থেকে একটি গল্প বলে বোঝান—'বাইবেলে একটা গল্প আছে। কুঁড়ে লোকের চলার পথে একটা সিংহ ছিল। আমি কিন্তু মনে করি গরীবের উপকারের জন্য যে লোকের ধনী এবং প্রভাবশালী মানুষের সম্পদকে ছোঁবার ক্ষমতা নেই, তারই চলার পথে সিংহ থাকে।' তিনি শাসকদলের যে কোন গর্হিত কাজকেই নির্ভয়ে সমালোচনা করতেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হবার পরও তিনি শাসকদলের কোন অন্যায় সমর্থন করেন নি।

সমগ্র জাতির উন্নতিকল্পে ব্যক্তি স্বার্থ, ধর্মের দোহাই, প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান থাকতে পারে না। ব্রিটিশরাজের কিন্তু

সমগ্র জাতিতে ভাঙন ধরিয়ে শাসন করার ঝোঁক ছিল। হরেনবাবু কলকাতা পৌরনীতির সংশোধনের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। এই প্রস্তাবিত নীতি মুসলমান সম্প্রদায়কে বেশী ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হরেনবাবু চেয়েছিলেন, কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকবে না। আগেই বলা হয়েছে, হরেন্দ্রকুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন এবং এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে তখন প্রোটেষ্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকরা পঁচানব্বইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। এর মধ্যে তেত্রিশটি উচ্চ মাধ্যমিক, আর বাকি বাষট্টিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল ছয়টিতে কৃষি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। হরেনবাবু এই আশা করেন, ক্রমে আরো বিদ্যালয়ে এই সুযোগ পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, 'সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের এতেই বেশী উৎসাহ। কারণ, আমাদের বেশীর ভাগ মানুষই গ্রামবাসী।' এই সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করার জন্য তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে একটি কমিটি বা কার্য্য-নির্বাহক সমিতি নিয়োগ করতে অনুরোধ জানান।

বাঙলা তখন মুসলমান সরকারের শাসনাধীনে। 1938 সালের 24 আগষ্ট মিয়া মহম্মদ আবদুল হাফিজ বঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়, বাঙলা রাজ্যের লোকসেবা আয়োগে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিয়োগের অনুপাত নির্ধারিত করতে হবে। মিয়া মহম্মদ নিম্নলিখিত হার অনুসারে ভাগাভাগি করতে চেয়েছিলেন :

মুসলমান	6%
তফশিলী সম্প্রদায়	20%
অন্যান্য	20%

পরবর্তীকালে হরেনবাবু এই প্রস্তাবটির দারুণ বিরোধিতা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এতে হিন্দুদের দাবী এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। 'যখনই দেশের চারদিকে তাকাই, দেখি বেশীর ভাগ স্কুল-কলেজ, রাস্তা, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল বর্ণ হিন্দুদের টাকায় তৈরী। উদাহরণস্বরূপ, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। হাসপাতাল আর ডাক্তারখানাটি সব সম্প্রদায়ের জন্য খোলা।' একজন

ভারতীয় খৃষ্টান হিসেবে তিনি মনে করেন, এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে ভবিষ্যতে হিন্দুদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে তিনি বলেন, 'দৈত্যের বাহুবল ভাল, তবে সেই শক্তিকে পিশাচের মত প্রয়োগ করা উচিত নয়।' হরেনবাবু উপলব্ধি করেছিলেন, পরস্পর সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা তিক্ত মনোভাব গড়ে উঠছে : 'আজ আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবেদন করবো, কিন্তু কখনো একজন কংগ্রেস-ভক্ত হিসেবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবে—সবাই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে কাজ করুন। ভাই-ভাইয়ের মতো কাজ করুন, এক টুকরো মাংসের জন্যে বাঘের মত ঝগড়া লড়াই করে নয়।'

নির্বাচকমণ্ডলীকে হরেন্দ্রকুমার বলতে বাধ্য হন—'আজ যারা এক ঐক্যবদ্ধ মহান ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করার আশায় দিন গুনছে, মহাশয়, আমি সেই স্বপ্নবিলাসীদেরই একজন। সেইজন্যই উক্ত প্রস্তাবটির প্রতি পদক্ষেপে ভয়ঙ্করের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আর সেই কারণেই এতে আমার ঘোরতর আপত্তি।'

'মুসলমানরা প্রতিনিধিত্ব করবে, এ কথা অনস্বীকার্য্য। তবে প্রস্তাবটি তারা যেভাবে এনেছে, তাতেই আমার আপত্তি। আমার তো মনে হয়, নির্বাচকমণ্ডলী যদি প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তাহ'লে আর এদের স্বার্থ এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্নই থাকে না।'

হরেনবাবুর ধারণা, ভারতীয় খৃষ্টানদের ছোট ছোট দাবী অবহেলিত হচ্ছিল। এ শুধু হরেনবাবুরই ব্যক্তিগত ধারণা নয়, বরং যে সব সংখ্যা-লঘুরা একসঙ্গে মিলে এক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় গড়তে চায়, এ অভিমত তাদেরও।

1947 সালে বিধানসভায় হরেনবাবু সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। 1947 সালের 20 জানুয়ারী কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে তিনি বিধিসম্মত-ভাবে গণ-পরিষদের সভ্য হন। সেখানে জহরলাল নেহেরু সংবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিষয়ে যে প্রস্তাব আনেন 21 জানুয়ারী হরেন্দ্রকুমার সেই প্রস্তাবটির ওপর ভাষণ দেন। 1949 সালের এই ভাষণটি সংবিধান প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করে। হরেনবাবুর এটি অন্যতম অবদান। হরেন্দ্রকুমার বলেন—'মাননীয় রাষ্ট্রপতি, সব সময় আমি আমার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটি ইংরেজী প্রবাদের নীতি অনুসরণ করে চলি—'শিশুদের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে তাদের কথা শোনার দরকার নেই।'

প্রস্তাবটি আমাদের সকলেরই সমর্থন করা উচিত। জগতকে জানাতে হবে, প্রস্তাবটির পেছনে ভারতের কতগুলো বড় দলই শুধু নেই, আছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সামাজিক ছোট ছোট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এই সংখ্যালঘুদের আমি একজন। তাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে। এই সংবিধানে যে নীতির কথা বলা হ'য়েছে, কংগ্রেস যতদিন তা মেনে চলবে, ততদিনই তার নেতৃত্ব বজায় থাকবে...

'এগুলো মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্যই সেসব প্রযোজ্য হবে। ধর্মীয় অধিকারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই উপাসনার স্বাধীনতা আছে। সেদিন আর নেই, যখন খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারক, মুসলমান মৌলভী বা শিখগুরু হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করলেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবেশ নিতে পারত। প্রত্যেক ধর্মই এখন আপন প্রচারকার্য্যে শক্তিশালী। মানুষকে ধর্মান্তর করার অধিকারও আছে...আমি বুঝি না, এ নিয়ে আমাদের কেন সন্দেহ থাকবে। খৃষ্টানদের বিষয়ে বলছি—প্রচার-কার্য্যে আমাদের অধিকারের কথা ব'লছি।' জাতীয়তাবাদে কংগ্রেসই তখন অগ্রগামী। 'এই দল, শুধু ভারতেরই নয়, এমনকি আমাদের মত ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘুদেরও আস্থাভাজন হয়ে উঠবে।'

গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচনে হরেনবাবুই একমাত্র প্রার্থী ছিলেন। সত্যনারায়ণ সিন্‌হা 1947 সালের 24 জানুয়ারী প্রস্তাবটি আনেন এবং তা গৃহীত হয়। পরদিন দেখা গেল, হরেনবাবুই একমাত্র প্রার্থী। সুতরাং তিনি বিধিসম্মত ভাবে নির্বাচিত হ'লেন। সেদিনের শেষ সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন—'আমাদের কয়েকজন সভ্য বলতে চান, সহ-সভাপতির নির্বাচনে সাফল্যের জন্য হরেন্দ্রকুমারকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ যেন তাঁদের দেওয়া হয়।' আমি অন্যকারো আগে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে চাই, অনেকেই বললেন। পরে হরেনবাবু সে সবের জবাবে বললেন, 'কি ভাবে আমি একজন সাম্প্রদায়িক খৃষ্টান থেকে ভারতের জাতীয় খৃষ্টান হলাম, আজ সেই কাহিনীই আপনাদের শোনাব, তাই আগে থেকেই আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করছি। ঘটনাচক্রে আমাকে রাজনীতিতে আনা হয়েছে—জেদের বশেই বলতে পারেন। সারা জীবনই তো আমি 'স্কুল-মাষ্টার'। তাই দেখাতে চেয়েছিলাম

একজন 'স্কুল মাষ্টার' একটা অসাধু ভোটদাতার চেয়েও ভাল হ'তে পারে। কিন্তু গভীর লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি ব্যর্থ হ'য়েছি ...আমি সাম্প্রদায়িকতা চেয়েছিলাম...আর সেইজন্যই আমার রাজনীতিতে আসা।' ভোট পাবার জন্য এইরূপ অপ্রীতিকর পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কারণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিটি ছিলেন একজন ঘোর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি।

স্বাধীনতার পর প্রথম কাজ ছিল, অবিলম্বে সংবিধানের খসড়া তৈরী করা। আর তাই গণ-পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি আর হরেন্দ্রকুমার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবাই ছিল পরিতৃপ্ত, হরেনবাবু অগাধ জ্ঞান আর লেখনীর সঙ্গে সকলের আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। 'ক্যালক্যাটা রিভিউ' পত্রিকাটির সম্পাদক আর মুখ্য সচিবের কলমের মাধ্যমে। কাজেই তাঁর রচিত বই ও প্রবন্ধে তাঁর অন্তরের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য আর দেশাত্মবোধের প্রকাশ তাঁকে দেশের নেতাদের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর দানের জন্যও হরেনবাবু বিশেষভাবে প্রসংশিত হন। সহ-সভাপতির বেতন হরেনবাবু গ্রহণ করেন নি।

গণ-পরিষদের কাজকর্ম 1947 সালের শেষের দিকে শুরু হয় এবং চলে 1951 সাল অবধি। হরেনবাবু সেই জটিল কাজ দৃঢ়তা আর সাহসিকতার সঙ্গে করেন। এই সময় রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় হরেনবাবুর ওপরই বেশীর ভাগ কাজের দায়িত্ব পড়ে। নানা দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সংবিধান সম্বন্ধেও হরেনবাবু অনেক জানতেন।

তিনি সব সময় বলতেন, তিনি একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কখনো কোনরকম বিশেষ সুযোগ সুবিধা চাননি। ভারতীয় খৃস্টানরা ভারতের রাজনীতিতে স্থান পেলেই তিনি খুশী ছিলেন। গণ-পরিষদের পরিচালন কাজে তিনি সবার প্রশংসাভাজন হ'য়েছিলেন। খাদ্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'স্ট্যানডিং কমিটি'তে হরেনবাবুকে সভ্য করা হয়। পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার সভারও তিনি সভ্য নির্বাচিত হন।

রাজ্যপাল

1951 সালের 25 অক্টোবর। নতুন দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ঘোষিত হল—রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ কৈলাশনাথ কাটজুকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যপদে নিয়োগ করেছেন। আর লোকসভার সদস্য ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী কৈলাশনাথের পদাভিষিক্ত অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হবেন। রাজা গোপালাচারীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদটি অলংকৃত করবেন ডঃ কৈলাশনাথ কাটজু। সেই সঙ্গে তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করবেন। সব নিয়মকানুন ভেঙ্গে হরেনবাবুকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করা হয়। কেননা, সেই প্রথম একজন রাজ্যের লোককে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল করা হল!

এন্টালীর ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে বসেই হরেনবাবু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হওয়ার মনোনয়নের সুখবরটি পেলেন। তিনি সাংবাদিকদের বললেন—সাংবিধানিক প্রধান হ'য়ে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবে জনগণের সদিচ্ছা আর সহযোগিতায় তিনি দেশের উন্নতি করতে তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তাঁর মতে, সারা দেশে (এবং পশ্চিমবঙ্গেও) অন্নবস্ত্রের জোগানই মূল সমস্যা এবং তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তুর আসা নিয়েও হরেনবাবু উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এদের যথাসম্ভব সাহায্য করা। তাদের বাস, অন্ন ও চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল বেশি। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এদের পুনর্বাসনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করার কথাও তিনি বলেন। তাঁর মতে, সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে গেলে শুধু রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা।

হরেনবাবু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে সরাসরি আবেদন জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভীতি দূর করতে তারা যেন সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁরা দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই গণ্য হবেন।

1951 সাল, 1 নভেম্বর। রাজভবনের দরবার ঘরটিতে (থ্রোন রুম) সকাল দশটায় শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। পরণে ধুতি আর গলাবন্ধ কোট। ব্যক্তিগত কর্মীদের সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে দরবার ঘরে তিনি প্রবেশ করেন এবং গিয়ে দাঁড়ান মঞ্চে। বঙ্গবালাদেবী হরেনবাবুর বাঁ-পাশের চেয়ারটিতে বসেন। শপথবাক্য পাঠ করান শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত নিয়োগপত্রখানি পড়ে শোনালেন মুখ্যসচিব শ্রী এস. এন. রায়, এবং রাজ্যপালের সচিব শ্রী এইচ. সি. সেন নিয়োগপত্রটি বাইবেলের ওপর রেখে রাজ্যপালকে দেন। এবার রাজ্যপাল শপথবাক্যের পুনরাবৃত্তি করেন।

তারপর আনুষ্ঠানিক রীতি অনুযায়ী শুরু হয় রাজ্যপালের পতাকা উত্তোলন এবং তার সঙ্গে সতেরটি তোপধ্বনি। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায়, শ্রী সি. সি. বিশ্বাস, পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা হাই কোর্টের কয়েকজন বিচারপতি এবং কলকাতাস্থ বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ, কলকাতার লর্ড বিশপ আর ক্যাথলিকদের কলকাতাস্থ আর্চবিশপও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা ছাড়া টোইনটিয়েথ ডিভিসন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। হরেনবাবু আর বঙ্গবালাদেবী সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গল্প-গুজব, হাসি ঠাট্টা করে বেড়াচ্ছিলেন। অচিরেই সবাই জানতে পেরেছিলেন, এঁদের এই ব্যবহার কোন সাজানো ব্যাপার নয়, বরং স্বভাবসিদ্ধ।

1951 সালের 31 অক্টোবর। ডঃ কাটজু ট্রেনে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন। এই উপলক্ষ্যে বিধানবাবু বিদায় সম্ভাষণ জানান। নতুন রাজ্যপালের মনোনয়নে বিধানবাবু বলেন, 'হরেনবাবু একজন খাঁটি খৃষ্টান এবং খাঁটি শিক্ষক।' একজন শিক্ষককে রাজ্যপাল করার জন্যে বিধানবাবু ভারত সরকার তথা রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান।

1956 সালের 7 আগষ্ট, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত হরেনবাবু রাজ্যপাল ছিলেন। বিধানসভায় এবং পরে গণপরিষদে তাঁর ভাষণগুলি থেকে হরেনবাবুর ব্যাক্তিত্বের তিনটি দিক ফুটে ওঠেঃ তাঁর সাম্প্রদায়িক বিরোধী মনোভাব এবং এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে

লড়াইয়ের প্রত্যয়, মাদকদ্রব্য বর্জনে তাঁর জীবন-সংগ্রাম এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাঁর উদ্বেগ।

রাজ্যপাল হবার পর, বড়দিন উপলক্ষে আকাশবাণীতে প্রথম ভাষণে তিনি বলেন, 'বহু বছর আগে জেরুজালেমে একটি ছোট্ট অপূর্ব সুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। আজ তাঁকে ঘিরেই একটা ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। আন্তরিকভাবে আমিও এই বিশ্বাসেরই অনুগামী। এ আমার বিশ্বাসের জন্য বিশ্বাস করা নয়...আমরা মনে করি, যে বিশ্বাসকে আমরা মেনে চলি আমাদের সাধারণ জীবনে এবং ধর্মীয় জীবনে তার গভীর তাৎপর্য্য আছে। এই ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, বর্তমানের অন্য কোন ধর্ম তা পারে না। আমাদের অখৃষ্টান ভাইদের কাছে বক্তব্য রাখার পক্ষে এটাই আমাদের যুক্তি। খৃষ্টান হিসাবে আমরা জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের দাবী রাখি। যেমন রাখে মুসলমান, শিখ, আর্য্যসমাজ আর তাদের সংগঠন এবং সুফি আন্দোলনের সভ্যরা।' উদাহরণ-স্বরূপ হরেনবাবু গীতার মূল কথা—'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, 'মানুষের জীবনই ধর্মক্ষেত্র—যেখানে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'হে, অর্জুন! ওঠো, জাগো!' গীতা আমাদের—এড়িয়ে যেতে শেখায় না, চুপচাপ ব'সে থাকতেও শেখায় না। গীতা শেখায় কর্মের যোগ—যা তাদের কাছে ছিল জয়ের গুপ্তমন্ত্র।'

হরেনবাবু রাজ্যপালের উচ্চপদমর্য্যাদা পেয়েও আগের মত সরল, সাধারণ মানুষই রইলেন। ঠিক আগের মতই লেখাপড়া, সাহিত্য, ধর্ম আর রাজনীতিকে আঁকড়ে রইলেন।

হরেন্দ্রকুমার রাজ্যপাল হ'লে পরে জনসাধারণের মধ্যে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরা খুসীও হয়, আবার এত সাদামাটা লোককে রাজ্যপাল হোতে দেখে বেশ আশ্চর্য্যও হয়। হরেনবাবুর মত একজন সৎ লোককে রাজ্যপাল রূপে পাওয়া সবার খুশির কারণ আর আশ্চর্য্য হওয়ার কারণ হোল, এইরকম একজন ব্যক্তিকে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে মনোনীত করাটা ছিল বেশ অদ্ভুত। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে, কংগ্রেসের প্রভাবশালী রাজনীতির সঙ্গে তিনি কিন্তু জড়িয়ে পড়েন নি।

ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। কিছুদিনের মধ্যে সবাই বুঝতে পারে, হরেনবাবু একজন অসাধারণ চরিত্রের মানুষ,—একজন বুদ্ধিজীবি এবং কর্মপরায়ণ। হরেন্দ্রকুমার রাজ্যপাল পদে নির্বাচিত হলে শিক্ষকরা খুব খুসী হন কারণ, আজ তাঁদেরই একজন রাজ্যপাল। এঁদের মতে, মনোনয়নে কোন ভুল ছিল না। বস্তুতপক্ষে, এই মনোনয়নে আসল মানুষটির গুণের কথাই ভাবা হয়েছিল, সেখানে অন্য কোন প্রশ্নের স্থান ছিল না।

সততার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সেই কারণেই হরেনবাবু বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নির্বাচিত হন। ইনি সকল সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ছিলেন। পক্ষপাত আর সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও তাঁর চরিত্রে ছিল না। এমন কি নিজের আত্মীয়দেরও কখনো অন্যায় অনুগ্রহ তিনি প্রদর্শন করেন নি। হরেনবাবুকে প্রথমে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু, তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ভাবলেন, উত্তর প্রদেশে চলে গেলে পশ্চিমবঙ্গের কোন কাজে লাগবেন না। নিজের রাজ্যের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। সেইজন্য সারা জীবনটা নিজ রাজ্যেই কাটিয়ে দেন। রাজ্যপালের পদ পেয়েও তাঁর স্বভাবে কোন পরিবর্তন বা উত্তেজনা দেখা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এর জন্যে মনে মনে ভগবানের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। রাজ্যপালের পদে পাঁচটি বছর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ।

তিনি অর্থ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে তার রাজ্যপালের দিনগুলোর সূত্রপাত করেন। আজও আমার মনে পড়ে, কিভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতার মহিলারা, নানারকম মেলা আর প্রদর্শনী করে হরেনবাবুর অর্থ তহবিলে প্রচুর টাকার যোগান দেয়। সব ঘরের মেয়েরাই হরেনবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতো। কারণ, তাঁর সরলতা আর সততা ছিল সর্বজনবিদিত। কাজেই এই মানুষটির জন্যে খাটতে সবাই প্রস্তুত ছিল। তাঁরা জানতেন, এই পরিশ্রম এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই। হরেনবাবু অতীব সরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাই কখনো ভাবতেই পারেন নি, রাজ্যপালের পক্ষে দাতব্য তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা খারাপ দেখায়।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার, নানা সভাসমিতিতে যেতেন, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতেন আবার কিছু জায়গায় শুভেচ্ছা পাঠাতেন। এগুলোও তাঁর নিত্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল। এই সব অনুষ্ঠানে তিনি আন্তরিক এবং সরলতা ভরা ভাষণ দিতেন।

সাংবিধানিক প্রধান হ'লেও তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমিত। বেশীর ভাগ সময়েই তাঁকে মন্ত্রিদের কথা মেনে চলতে হোত। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ কোন সমস্যাও ছিল না, আর সেজন্যই হয়তো কোন বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণে তাঁর কোন অসুবিধা ঘটে নি।

সরকারী কাজে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বুঝতে পেরেই তিনি বেশী করে রাজ্যের উন্নতি আর কল্যাণকার্য্যে মন দেন। এখনও আমার মনে পড়ে, একবার তিনি এক পাটকলের কর্মীদের অনুষ্ঠানে যান। কর্মীরা কিভাবে আছে, সেদিকেই ছিল তাঁর বেশি কৌতূহল। সর্ব-হারাদের তিনি ভালবাসতেন, এদের সঙ্গে থাকতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করতেন।

রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর অন্যতম পরিকল্পনা ছিল, যক্ষা রোগীদের থাকা আর রোগোত্তর সেবা শুশ্রূষার জন্য একটা কলোনি গড়ে তোলা। এর জন্য তিনি দুটি তহবিল খোলেন। এই পরিকল্পনার কথা প্রচার করে জনগণের কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য চেয়ে আবেদন জানান। জনগণ এ ব্যাপারে বিপুলভাবে সাড়া দেয় আর ক্রমে তাঁর তহবিলে অঙ্ক বাড়তে থাকে। একটি ছিল, দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল আর অন্যটি ছিল যক্ষা রোগোত্তর শুশ্রূষা কলোনি তহবিল। অসংখ্য যক্ষারোগীদের দুর্দশায় হরেনবাবু খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দারুণ রোগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর মানুষের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। এই রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সরকারকে কিছু-ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি ঠিক করেন।

প্রসূতি ও শিশুকল্যাণের জন্য দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল পাঁচ লাখ টাকা যোগাড় করে। যেহেতু হরেনবাবু তাঁর যথা সর্বস্বই দান করে দিয়েছিলেন, তাই অন্যদের এই বিষয়ে প্রেরণা যোগাতে তাঁর কোন অসুবিধাই ঘটে নি। দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলের টাকা থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'স্টেপ এ্যাসাইড' নামের বাড়ীটি কেনেন। দার্জিলিঙের এই বাড়ীটি প্রসূতিসদন ও শিশু কল্যাণ চিকিৎসালয়ে পরিণত হয়।

পরে যক্ষারোগীদের আরোগ্যশালাটিও এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। হরেনবাবু এই সংস্থাটির নাম রাখেন—'দেশবন্ধু ও বিধানচন্দ্র চিকিৎসালয়'। বঙ্গবালাদেবী এই চিকিৎসালয়টির উদ্বোধন করেন। চিত্তরঞ্জনের 'স্টেপ-এ্যাসাইড' অচিরেই বাঙালীর তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

যক্ষা কলোনি গড়ে তোলার জন্য মেদিনীপুর জেলার দীঘায় বেশ বড় একটা জমি কেনা হয়। যক্ষা থেকে সবে সেরে উঠেছে, এমন লোকেদের পক্ষে এখানকার জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর। দুর্ভাগ্যবশতঃ, হরেনবাবু তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান। এখন আর কেউই এই কলোনির কথা বিশেষ জানে না।

রাজ্যপালের পাঁচ বছরের কর্মসূচীর মধ্যে তাঁর আরেকটি কাজ হোল—জনসাধারণের, বিশেষ করে নেপালীদের মধ্যে গীতা আর রামায়ণের বাণী প্রচার। দার্জিলিঙের নেপালীদের সাংস্কৃতিক বোধের অভাব দেখে হরেনবাবু খুবই দুঃখিত হন। নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা আর অন্যান্য পাহাড়ীরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ ছিল। হরেনবাবু গুরখা ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়েছিলেন। দু'টাকা করে বইয়ের দাম রাখা হয়। দশ হাজার বই ছাপিয়েছিলেন। একজন নেপালী পণ্ডিত টীকা সহযোগে সরল গুরখা ভাষায় গীতা আর রামায়ণ অনুবাদ করেন। নেপালের মহারাজা, বিড়লা ভ্রাতারা এবং অন্যান্য ধনী পৃষ্ঠপোষকদের অর্থ দানেই তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। হরেন্দ্রকুমারের ইচ্ছা ছিল, প্রত্যেক গুরখা সেনা যেন একটা করে বই রাখে। মহাভারতও তিনি এইভাবে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবন আলেখ্য লেখানো এবং জনগণের কাছে তা প্রচার করার ইচ্ছাও হরেনবাবুর ছিল। কিন্তু এই কাজ শেষ হবার আগেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।

হরেন্দ্রকুমার নেপালীদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান প্রচারে বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। পাহাড়ীদের অভাব অনটন তাঁকে গভীর ভাবে বিচলিত করে। তাঁর মনে হোত, এরা অবহেলিত। হরেনবাবু ভালবাসা দিয়ে এদের হৃদয় জয় করেন। তাঁর কাছে এরা ছিল চিরকৃতজ্ঞ।

লেখক ও বক্তা

হরেনবাবু অনেক বই লেখেন। এ ছাড়া সেই সময়কার বিতর্কমূলক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা অনেক পুস্তিকাও তার আছে। বেশীর ভাগ রচনাই অবশ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক সমস্যার ওপর। তাঁর লেখার শৈলীতে কিন্তু কোন চমক ছিল না। ইংরেজীতে লিখলেও ভাষাটা যেন আইনসভার নিয়মকানুনসম্মত নিরস গদ্য। মাধুর্য্য বা অলঙ্কার-শূণ্য। কেবল বিষয়বস্তু আর যুক্তিতে ঠাসা। কোন বিষয় নিয়ে লেখার আগে তিনি সেই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। হরেনবাবুর লেখা আর ভাষণে তাঁর মননশীলতা যৌক্তিকতা আর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। তিনি যে কোন কথা সহজেই বুঝতেন আর বোঝাতেও পারতেন। অবসর বিনোদনের জন্য কেউ কিন্তু চট করে হরেনবাবুর বই পড়েন না। কোন বিষয় নিয়ে যদি কেউ পড়াশোনা করতে চায় তো, একমাত্র সে-ই হরেন্দ্রকুমারের লেখা পড়েন। একজন জীবনীকার হরেনবাবুর লেখা আর বক্তৃতার সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের তুলনা করেন। প্রথমে একটি সমস্যা বেছে নিতেন। তারপর সেই সমস্যাটিকে নির্ভয় অদম্য কঠোরতার সঙ্গে ভালমন্দ বিচার করে তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হোতেন। সব সময় পাঠকদের বুঝিয়ে দিতেন, কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান পিপাসা আর জানার আগ্রহ ছিল। তিনি শাসনতন্ত্র, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য আর পুষ্টি, যোগ ব্যায়াম, মাদক দ্রব্য বর্জন, কংগ্রেস ও গান্ধীবাদ নিয়ে পড়াশোনা করেন। এগুলি ছাড়াও তিনি মার্কস্‌বাদ, সমাজবাদ, আধুনিক মানবধর্ম, অস্তিত্ববাদ আর নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারবাদ সম্বন্ধে পড়তেন। হরেনবাবুর দারুণ নেশা ছিল বড় বড় দোকান থেকে বই কেনা। এখনকার মত, তখনকার দিনে বইয়ের দাম এত ছিল না। ভারতবর্ষে নতুন বই আসা মাত্রই দোকানদার বেছে তাঁর বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। আর হরেনবাবু নিজের পছন্দমত বই তা থেকে কিনে নিতেন। এইভাবেই তিনি প্রায় সব বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

এই রাশীকৃত বই থেকেই তাঁর একটি বিরাট দুর্লভ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। পরে হরেনবাবু এই গ্রন্থাগারটি উইল করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। তাঁর লেখাগুলোতেই হরেনবাবুর অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর হরেন্দ্রকুমার গভীর রাত অবধি পড়াশোনা করতেন। পড়াশোনায় বেশী সময় দেবার ফলে কাজকর্ম খানিকটা ব্যাহত হোত ঠিকই, তবে তার স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল।

হরেনবাবুর লেখায় তাঁর ব্যক্তিত্ব যেভাবে প্রকাশ পায়, তা থেকে মনে হয়, তিনি একজন বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন তবে অধিকার এবং ন্যায়-নীতির ওপর জোর দিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিতে সে পরিচয় মেলে না। এইসব কারণে তাঁর লেখাগুলো একটু যেন একঘেঁয়ে। প্রধানতঃ তিনি মাদকদ্রব্য বর্জন, কৃষিশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘুদের সমস্যা, কংগ্রেস আর জনসাধারণ এবং গান্ধীবাদ নিয়ে লেখেন। এসব ক্ষেত্রে তথ্য আর হিসাব নিকাশ হরেনবাবুর নখদর্পনে ছিল। 1948 সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। একদিক দিয়ে এই রচনাটি খুবই মনোরম হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে যাদের কোন আগ্রহ নেই বা এর ভাল-মন্দ নিয়ে যারা মাথা ঘামায় না, তাদের বইটি বিশেষ ভাল লাগবে না।

শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তিনি চিরবিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আশাকরি কেউ কিছু মনে করবেন না, যদি আমি বলি, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ গড়ে উঠেছে, বেশীর ভাগই ওপরতলার লোকেদের নিয়ে। সাধারণের কল্যাণ বা উন্নতির জন্য এঁদের বিশেষ কোন দরদ নেই।' এই মন্তব্যের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলই জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতো না। শিক্ষা বা আর্থিক উন্নতিতেও এদের কোন হাত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ মমিন সম্প্রদায়ের কথা বলা যেতে পারে। এই সম্প্রদায়ে মোট মুসলিম জনসংখ্যায় শতকরা 30 কি আরো বেশী ভাগ মুসলমান ছিল। এরা অভিযোগ করে, 'ওপরতলার মুসলমান নেতারা বিশেষ করে মুসলিম লীগের সভ্যরা এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সুযোগে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে।' এই মমিনরা এমনও অভিযোগ

করে, উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নেতারা এদের তৈরী জামাকাপড় কেনে কিনা সন্দেহ। এমনকি মমিনরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে এবং বিধানসভায় নিজেদের আলাদা আসন দাবী করে। 'কারণ এরা মনে করেছিল, তাদের প্রাপ্য আদায় করার এটাই একমাত্র উপায়।'

দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ নিয়ে বিতর্কমূলক বিষয়টি উক্ত বই-এর অন্তর্গত। হরিজনরা সাধারণত সমধর্মীয় ওপরতলার লোকেদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত।

কংগ্রেসের হাত দিয়েই আসলে খাঁটি কাজগুলো সব হ'য়েছে। 'এত বছর ধরে হিন্দু মহাসভা সাধারণের জন্যে কি করেছে?' এ প্রশ্ন হরেনবাবু তোলেন। তাঁর মতে হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লীগের নেতারা শুধুমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই নিজেদের সুবিধামত, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁরা স্বার্থসিদ্ধি করে। এই প্রতিষ্ঠান দু'টি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। একমাত্র কংগ্রেসই সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সংস্কার-মুক্ত সম্পর্ক রেখেছে।

হরেন্দ্রকুমার 'দি ক্যালক্যাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন। মডার্ণ রিভিউ, উইকলি ফরোয়ার্ড, পাটনার হিন্দুস্থান রিভিউ এবং আরো অনেক পত্রিকায় তিনি লিখতেন। মহাদেব দেশাইয়ের অনুপ্রেরণায় তিনি 'হরিজন' পত্রিকাতেও লিখতেন। বিশেষ করে, মাদকদ্রব্যের অপকারীতা ও পরিবর্জনের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি সেখানে লেখেন। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পর 'হোয়াই প্রহিবিশন' এই শিরোনামে এক-খানি বই লেখেন এবং মহাত্মাগান্ধীর পুণ্যস্মৃতিতে তা উৎসর্গ করেন। এই বইখানির বিক্রীর টাকা 'গান্ধী স্মৃতি তহবিলে' দেওয়া হয়।

1945 সালের গোড়ার দিকে 'কংগ্রেস ও জনগণ' নামে আরেকটি ইংরেজী বই লেখেন। কে. এম. মুন্সী এই বইটির মুখবন্ধে লেখেন, 1942 সালে বিখ্যাত ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় নিখিলভারত কংগ্রেস পরিষদ ঘোষণা করে ক্ষমতা এলে তা সারা ভারতের জনগণই পাবে। এই বইটিতে জনগণের জন্যে কংগ্রেস কি করেছে, হরেনবাবু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। তিনি জানান এ. ও. হিউম 1885 সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি ইংরেজ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত একজন সচিব ছিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, হিন্দু,

মুসলমান আর ভারতীয় খৃষ্টান মিলে এই সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলে। মুসলিম লীগ 1906 সালে গড়ে ওঠে, ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিশেষ প্রতিনিধিত্বের মারফৎ মুসলিম লীগের রাজনৈতিক স্বার্থ আর অধিকাররক্ষাও ছিল তাদের লক্ষ্য। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ একসঙ্গে কাজ করে। তার পরেই সাম্প্রদায়িক লড়াই শুরু হওয়াতে দু'টি দল আলাদা হয়ে যায়। মুসলমানরা সাইমন কমিশনে যোগ দেয় আর হিন্দুরা ঐ কমিশন বর্জন করে। এইভাবেই দুই দলে ফাটল ধরে। 1935 সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অনেক রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে। এই সুযোগে এম. এ. জিন্না 'ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপদাপন্ন' বলে ধুঁয়ো তোলেন। আর একথাও বলেছিলেন, হিন্দুদের অত্যাচারে মুসলমানরা অসহায় বোধ করছে। হিন্দু মুসলমানের বিতর্কীত বিষয় সম্বন্ধে হরেনবাবু বিভিন্ন দলের চিন্তাধারা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। যদিও বোম্বের কাপড় কলের মালিকরা কংগ্রেসকে চালাত এবং সাহায্য করত—তবু এটাও সত্যি মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন এবং জনগণের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। সাধারণের উন্নতিতেই তাই কংগ্রেস ব্যপৃত ছিল। 1935 সালে ভারত আইন অনুসারে, কংগ্রেস ব্যাপক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। এই শিক্ষাসূচীতে হস্তশিল্প, হাতে কলমে কাজ শেখা, গ্রাম উন্নয়ন এবং জমির মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলায় বিশেষ জোর দেয়। এই পরিকল্পনা প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই উৎসাহিত করে। সর্বভারতীয় তন্তুবায় সংঘই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। হরেন্দ্রকুমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জনগণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ব্যাখ্যা করেন। নির্বাচনে জেতার পর মুসলিম লীগ আর হিন্দু মহাসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে হরেনবাবু অবশ্যই যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন।

1945 সালে, স্বাধীনতার আগে, হরেনবাবু একখানি বই লেখেন। এই বইটিতে রয়েছে ইংরেজরা ভারতবর্ষের চা বাগান, কয়লা খনি, পাট, বস্ত্রশিল্প, বিদ্যুৎ, এবং জাহাজ শিল্পকে কীভাবে শুষে নিচ্ছে তার বর্ণনা। সে সময় ইংরেজরা কিছু মূলধন লাগিয়ে, ভারতীয় শ্রমিক এবং ভারতের কাঁচা মাল দিয়ে সস্তায় কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। এ সব

দেখে হরেনবাবুর মনে হয়, ভারতবর্ষ লুট হয়ে যাচ্ছে। এই বইটিতে হরেনবাবু কংগ্রেসের নানাবিধ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলেছেন। [এ ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক, উৎপাদনশিল্প আর সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য বই-এর মধ্যে রয়েছে : 'যীশুখৃষ্টের অনুগামী' (হি ফলোস্ ক্রাইষ্ট), 'ব্রিটিশ উৎপাদন শিল্পে ভারতীয়রা' (ইণ্ডিয়ানস্ ইন ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিস্), 'কংগ্রেস ও জনগণ' (কংগ্রেস এণ্ড মাসেস), 'কংগ্রেসের কিছু অরাজনৈতিক সাফল্য' (সাম নন-পলিটি-ক্যাল এ্যাচিভমেণ্টস্ অফ কংগ্রেস), 'আমাদের মাদক দ্রব্য সমস্যা' (আওয়ার হাম্প-ড্রাগ প্রবলেম), 'বাংলা-বিহারের কয়লা খনি' (কোল-মাইনিং ইণ্ডাস্ট্রিস অফ্ বেঙ্গল এ্যাণ্ড বিহার) ও 'কেন মাদক-দ্রব্যের পরিবর্জন' (হোয়াই প্রহিবিশন) উল্লেখযোগ্য।

চল্লিশ বছর ধরে হরেনবাবু শিক্ষকতা করেন। পরে বাঙলার বিধানসভার সভ্য, গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হ'য়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের পদাধিকার বলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তিনি বক্তা হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন। কোথাও বলার আগে, প্রথমে তিনি বিষয়টি বেছে নিতেন, তারপর সেই বিষয়ে বেশ ভাল করে পড়াশোনা করে, বেশী বাজে কথা না বলে ঠিক যেটুকু বলার, বলতেন। সত্যকে সমর্থন করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যায় বা অসাধুতাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

হরেনবাবুর অনেকগুলো বক্তৃতার ইতিমধ্যেই সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই শিক্ষা-সমস্যা সংক্রান্ত। হরেন-বাবু, সংবিধানের কিছু সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়েও প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রবর্তনে তিনি যে সব যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন, সেগুলো মেনে নিলে আর আজকের সমস্যার সম্মুখীন হতে হোত না। হয়তো বা এই সমস্যাগুলো তেমন ভীষণাকার ধারণও করতো না।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি থাকাকালীন, শিক্ষকদের দুরবস্থা দেখে হরেনবাবু বিচলিত হন। এই বিষয়ে তিনি সরকারের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করেন।

শিক্ষার ইংরেজী মাধ্যমই তাঁর পছন্দ ছিল। তিনি মনে করতেন,

ইংরেজের কাছ থেকে তাদের ভাষাটা আমাদের যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন। দামী স্কুলে পড়লেই অন্যদের চেয়ে আলাদা বা লেখাপড়ায় ভাল হওয়া যায়, হরেনবাবু তা মনে করতেন না। তিনি চাইতেন, স্কুলের ছেলেরা যেন 'মেয়েলি পুরুষ' বা শুধুমাত্র একটা দামী অর্কিডের মত বাড়ীর শোভা না হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর, কিন্তু কঠোর বাস্তব জীবনে দাঁড়াতে অসমর্থ এমন না হয়। 'পাব্লিক স্কুলে'র ছেলেরা সব সময় উন্নাসিক হয়, এই ধারণাই তাঁর ছিল।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ওপর হরেনবাবুর বিশেষ আস্থা ছিল না। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সবাইকে তিনি সতর্ক করে দিতেন।

আগেই বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তাঁর ভাষণ ছিল বেশ স্পষ্ট আর সমালোচনামূলক। সরকারের বাজে খরচা তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি বিশেষ জোর দিতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতা করতেন তিনি। পাঠ্যসূচী আর শিক্ষাক্ষেত্রে অদল বদলের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন। তবে পাবলিক স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে চলবে, এটা তিনি আশা করতেন।

1939 সালে লাহোরে ফোরম্যান খৃষ্টান কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। হরেন্দ্রকুমার এই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ষোল বছরের ওপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন। খৃষ্টান সমিতির সঙ্গেও তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সমিতিগুলো অ-খৃষ্টানদের জন্যে কিছুই করে না, এই রকম অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর অ-খৃষ্টান ছাত্র আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো এত কেন জনপ্রিয় ছিল? কারণ, এরাই উচ্চমানের শিক্ষার প্রবর্তক বলে। এদের ছাত্রাবাসে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে সুষম খাদ্যাদি পরিবেশিত হোত। জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হোল, এখানে ছেলেদের সভ্যতা, ভদ্রতা আর শৃঙ্খলাপরায়ণতা শেখান হোত। তাছাড়া বিদ্যালয়ে কোনরকম ছাত্র সংগঠনও ছিল না। অনেকে আপত্তিকর যা দেখেছে, তা হ'ল এখানে ধর্মগ্রন্থ পড়তেই হোত।

কেননা, এর অর্থ ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। ফলে, অন্য ধর্ম ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। বিদ্যালয়ে ছেলেদের নৈতিক আর ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে হরেনবাবু মনে করতেন না। ছোটরা যদি বুঝতে পারে, তাদের জোর করে শেখান হচ্ছে, তাহলে ভাল তো হয়ই না বরং খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। শুধুমাত্র পরীক্ষায় সফল হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই বিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য নয়, হরেন্দ্রকুমারের এই ধারণাও ছিল। তিনি এও মনে করতেন, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য ছাত্রদের মানবিকতা আর নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করা। তিনি মনে করেছিলেন, এই কাজ নিশ্চয়ই ভাল অবশ্য যদি কেউ 'আমাদের প্রভুর বাণী-ভক্তি-ভরে মেনে চলে। খৃষ্টান হিসেবে একথা আমি নিশ্চয় মানব, আমি আমাদের সম্প্রদায়ের সর্বতো প্রসারকে স্বাগত জানাই—যদি লোকে যীশুর বাণীতে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষকে বদলে ভাল পথে আনতে অন্যদের চেয়ে খৃষ্টধর্মের ক্ষমতা বেশী। আমরা আমাদের অ-খৃষ্টান ভাইদের একথাই বলব। অন্যদের মতো আমরাও ধর্মপ্রচারে সমান অধিকার দাবী করি। তাব'লে অন্যের স্বাধীনতা ব্যহত হওয়া ঠিক নয়।' তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, 'ধর্ম বদল করে আমরা কিন্তু আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বদলাইনি। ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে আপোষ না করা পর্যন্ত আমরা এদের কেউই নই। সেইজন্য জনগণের উন্নতির জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলা।' ভারতীয় খৃষ্টানদের কিছু কিছু স্বভাব এবং আচার-ব্যবহার হরেনবাবুর খুব খারাপ লাগতো কিন্তু 'আমি আমার মনের শান্তি ওসবে নষ্ট হ'তে দিইনি।' ব্রিটিশের ভারতেই কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুরু হয়। হরেনবাবু সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বলা যায় আজকের এই সাম্প্রদায়িকতা, ইংরেজ আমলের শুরুতেই অঙ্কুরিত হয়। 1939 সালে লাহোরে ফোরম্যান খৃষ্টান কলেজে ভাষণ দেবার সময় হরেনবাবু, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ওপর কঠোর মন্তব্য করেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে তিনি সরকারী সাহায্যে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ হিন্দু পাঠশালা, মুসলমানদের মক্তব আবার একই সঙ্গে প্রাচীন পন্থী হিন্দু পরিবারের ছেলেদের জন্যে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দেখেছেন। 'কিন্তু কোনটাতেই প্রয়োজনীয় কর্মী বা বাড়ী বা পরিচালন ব্যবস্থা ছিল না।' প্রত্যেক বিদ্যালয়ে খুব অল্প সংখ্যক খৃষ্টান শিশুরা পড়তো, 'কিন্তু কেউ ভাবতো না যে, এইসব শিক্ষায়তনগুলো একত্র করে একটি সুনির্মিত বাড়ীতে সুশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়।' তাঁর মতে এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ক্ষতিকারক। কারণ সাম্প্রদয়িক মনোভাব সর্বভারতীয় দেশপ্রেমের অপমৃত্যু ঘটায়। সেখানে সবাই যে যার স্বার্থসিদ্ধি করতেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তিনি মনে করতেন, খৃষ্টান বিদ্যালয়ের পরিবেশটি বেশ শান্ত, সুন্দর। হরেনবাবুর মতে তা অন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশের তুলনায় একেবারে উল্টো। তিনি বলতেন, খৃষ্টান বিদ্যালয়গুলি গুরুত্ব দিত সংস্কৃতির ওপর। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিই স্বাধীনতার আগে 'মাতৃভূমিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করেছে। অস্পৃশ্যতা সমাজের অভিশাপ স্বরূপ।' আজও আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষের এই পাপের মাশুল দিচ্ছি। যীশু সম্বন্ধে হরেনবাবু বলেন, 'যীশু তার সময়ে ক্ষুধিতকে অন্ন দিয়েছেন, অসুস্থ্যদের করেছেন সুস্থ্য আর অজ্ঞান মানব সমাজে দিয়েছেন জ্ঞানের আলো।'

বড় অভাব অনটনের মধ্যে হরেনবাবুর শৈশব কাটে। বিদ্যালয়ে যাবার মত জামাকাপড় ছিল না। বিদ্যালয়ের নানা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তরও ঠিকমত পান নি। এসব দিনের কথা চিরদিন তাঁর হৃদয়ে গাঁথা ছিল। এইজন্যেই বোধহয় পরবর্ত্তীকালে তিনি গরীব-দরদী হয়ে ওঠেন। নানা সংস্থায় প্রচুর দান করেন। একবার দার্জিলিং পলিন স্কুলে ভাষণ দেবার সময় তিনি তাঁর পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সে তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

জীবনের নানা বিষয়ে হরেনবাবু বক্তৃতা করতেন, বিশেষ করে রাজ্যপাল হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতাগুলোয় তা স্পষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি' নামে একখানি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করে। এই স্মরণীয় সংখ্যাটিতে তাঁর ভাষণগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এস. সি. লাহিড়ী বইটির মুখবন্ধ লেখেন। প্রমথনাথ ব্যানার্জি, হরেনবাবুর গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বইখানির পরিচিতিটি ইনিই লেখেন।

কংগ্রেস ও জনগণ

আগের পরিচ্ছেদেই হরেন্দ্র কুমারের 'কংগ্রেস ও জনগণ'* বইটি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু, এই বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করলে বোঝা যাবে হরেনবাবু কংগ্রেস আর জনসাধারণকে কত গভীর ভালবাসতেন। আর এও বোঝা যাবে, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তাঁকে কতখানি প্রভাবিত করে। এই পরিচ্ছেদে ক্রমশ: হরেনবাবুর উক্ত বইখানির আদর্শ বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

'কংগ্রেস ও জনগণ' বইটির মুখবন্ধে কে. এস. মুন্সী বলেন, 'একজন ভারতীয় খৃষ্টান উদার আর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে জনসাধারণের প্রতি কংগ্রেসের কর্তব্য আলোচনা করতে বসেছেন।...এমন ভাবে এই আলোচনা করেছেন যাতে সমাজের যে কোন নিরপেক্ষ জনকল্যাণ-কামী মানুষ তুষ্ট হন।' অধ্যাপক মুখার্জির সকল সম্প্রদায়ের এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। এর ফলে তিনি সচেতন ভোটদাতা আর বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন সত্যান্বেষীদের তুষ্ট করেন। বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর চলার পথ সুগম হয়। 'ভারতবর্ষের কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্ট, নগ্নদেহ আর নিরাশ্রয় মানুষ মাঠে ঘাটে, কলকারখানায় মজুরী করছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এদের নিয়েই আজকের (1945) কংগ্রেস দাঁড়িয়ে আছে। আজ যদি কংগ্রেস মুক্তি আন্দোলনে জয়ী হতে চায় তাহলে তাকে প্রচুর কাজ করে যেতে হবে। শুধুমাত্র আদর্শের বুলি আওড়ে আর কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের রঙ বদলালেই চলবে না। এর জন্য চাই বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।'

উক্ত বইখানির মুখবন্ধে হরেন্দ্রকুমার বলেন, নিখিল ভারত খৃষ্টান পরিষদের সভাপতি আর এই পরিষদেরই সাধারণ-সাংগঠনিক সম্পাদক-

---

* এই পরিচ্ছেদে গৃহীত সব উদ্ধৃতি ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর **Congress and the Masses** বই থেকে উদ্ধৃত।

রূপে, 1937 থেকে 1944 পর্যন্ত ভারতের নানা খৃষ্টান কেন্দ্র পরিদর্শন করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। শুধুই যে সমধর্মীয় লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে তা নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে বরণ করেছে। হিন্দু ও তফশীল জাতি, মুসলমান ও পার্শিরা তাদের কাজকর্ম তাঁকে দেখিয়েছে। এদের বেশীর ভাগই ছিল কংগ্রেস সমর্থিত বা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এই বইটিকে 'ভারতের সেবক মহাদেব দেশাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।'' মহাদেব দেশাই-ই প্রথম বলেছিলেন, একজন লেখকের, কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় মনোভাব লিখে রাখা উচিত।

মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের গোড়া পত্তনের কথা আগের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। 1923 সালে কাশীতে হিন্দু-মহাসভার প্রথম অধিবেশন বসে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই অধিবেশনের পৌরহিত্য করেন। মদনমোহন মালব্য আর লালা লাজপত রায় অভিযোগ করেন, কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়েও বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক আর অন্য অরাজনৈতিক বিষয়গুলোর সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সেইজন্যই হিন্দু মহাসভা গঠিত হ'ল। কিন্তু 1933 সালের পরই হিন্দুমহাসভা একটি 'সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দল' রূপেই চিহ্নিত হয়। 1938 সালে নাগপুরে ভি. ডি. সাভারকর সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এখানে শুধুই হিন্দুদের দৃষ্টিতে হিন্দু-রাজনীতি করব। যাতে হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে।'

যে কংগ্রেস ভারতবর্ষের ধনী-সম্প্রদায় আর গান্ধীজী দ্বারাই কেবলমাত্র সমর্থিত তারা একথা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও হরেন্দ্রকুমার বলেন, 'জহরলাল নেহেরু আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎসাহে সামাজিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে আগাম সামাজিক কর্মসূচী ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কংগ্রেসই শুরু করে। এবং জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই তা করা হ'য়েছিল। জনগণ কখনো অবহেলিত হয়নি। মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস সব দলই পুঁজিবাদীদের সমর্থন পেত। কংগ্রেসের পিছনে যে পুঁজিবাদীরা ছিল 'তারা বহু আগেই বুঝতে পারে, কংগ্রেসের জন্য এরা যতই ব্যয় করুক না কেন, কংগ্রেস সাধারণের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার কাজেই হাত দেবে।

কিন্তু অন্য দু'টি প্রতিষ্ঠান সাধারণের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি বা এই কাজে লেগেও থাকেনি।' কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য, কংগ্রেস কখনো অন্যদের ক্ষতি করেনি। মুসলিম লীগ কিন্তু শুধু মুসলমানদের জন্যই কাজ করে গেছে। আর হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের জন্য। উদাহরণস্বরূপ খদ্দর কেনার ব্যাপারটা বলা যেতে পারে। মুসলিম লীগ শুধু মুসলমানের দোকান থেকেই খদ্দর কিনতে বলে। আবার, হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের দোকান থেকেই কেনার নির্দেশ দেয়। এটা কিন্তু নিখিল ভারত তন্তুবায় সমিতির কর্মপন্থী বিরোধী। সাম্প্রদায়িক কালের একটি বিবরণে প্রকাশ, যে কোন সম্প্রদায়ের তাঁতী আর সূতো কাটনিরা এই সমিতিতে যোগ দিতে পারে। তাঁতী যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, ক্রেতা তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভা কেউ কিন্তু নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্যেও কিছু করেনি। হরেন্দ্রকুমার বলেন, 'আগেকার কাজকর্ম থেকে এইটুকুই বোঝা যায়, এরা জনগণের উন্নতিতে কিছুই করেনি। উপরন্তু এই দলগুলোয় ওপরতলার মানুষের ভিড় ছিল বেশী। আশাকরি, এই মন্তব্যে আমায় কেউ ছিদ্রান্বেষী ভাববেন না। এই নেতারা যদি সাধারণের সঙ্গে কখনো কোন যোগাযোগ করে থাকেন তো, সে শুধু ধর্মীয় মনোভাবের সুযোগে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই কারণে তাঁরা ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা করেন। তারা ক্বচিৎ কখনো সাধারণের সুবিধার্থে সংগ্রাম করেছিল। এদের মানবপ্রেম এবং প্রকৃত নেতৃত্বই এই সংগ্রামের একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখাবার চেষ্টা করতো। মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন তুলে নালিশ জানায়। ওদিকে হিন্দু মহাসভা ঐ নালিশের প্রতিবাদ করে। গরীবের জন্যে এরা যা করেছিল, তা থেকে সাম্প্রদায়িকতা চরম রূপ নেয়। এরা হিন্দু মুসলমানকে আলাদা রাখার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কংগ্রেস গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী সকল সম্প্রদায়কে একটি সুখী পরিবারে পরিণত করতে চেয়েছিল।' হরেনবাবুরও এটাই মুখ্য আদর্শ ছিল। তিনি কংগ্রেসের বাইরে, সাম্প্রদায়িকতার প্রবণতা একটার পর একটা দেখাতে থাকেন।

হরেনবাবু মনে করেন, 'চাষীরাই তখন প্রকৃত নায়ক।' এদের

সহযোগিতা ছাড়া আজকের দিনের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা অসম্ভব। এই মন্তব্য থেকে আমরা হরেনবাবুর ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই। কারণ, বর্ত্তমানে সমগ্র জাতির উন্নতি নির্ভর করছে চাষীদের কল্যাণের মধ্যে। তিনি অনুভব করেছিলেন, 'গণ-আন্দোলনই এদের অবস্থার উন্নতি করবে। সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে কলঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। জনসাধারণের দুর্দশা সব দলই উপলব্ধি করেছিল...প্রাথমিক শিক্ষা, ভাড়াটের অধিকার আর টাকা ধার, এই বিষয়ে আইনের প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করে।' সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল বলেই এগুলো স্বীকৃত পায়।

1931 সালের কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে প্রাথমিক অধিকার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা এলে, সামরিক খরচা কমিয়ে তারা তা অন্ততঃ অর্দ্ধেক করবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মীদের খরচও কমিয়ে আনা হবে। এই প্রস্তাবে লবণ কর নাকচ করার কথা বলা হয়। অপরপক্ষে, উত্তরাধিকার করও ধীরে ধীরে কার্যকর করা হবে। দেশের বড় বড় শিল্পসংস্থা যেমন রেল ইত্যাদির জাতীয়করণের প্রস্তাবও সেখানে নেওয়া হয়।

দেশে তখন দারুণ খাদ্যসমস্যা চলছিল। বাধ্য হয়ে লোকেরা প্রয়োজনের চেয়ে কম খাচ্ছিল। ফলে, সকলেই অপুষ্টিতে ভুগছিল। অপুষ্টি থেকেই রোগের উৎপত্তি। বছরে হাজার হাজার লোক এই অপুষ্টিতে মারা যেতে লাগলো। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখেই অনাহারের করুণ প্রতিচ্ছবি। করাচি প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়, 'কংগ্রেস চাষী আর মজুরদের অধিকার সমর্থন করছে শুধু নিজেদের স্বার্থে একটা সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে।'

যেমন কাপড় সম্বন্ধে বলা হয়, নিজেদের দরকারে নিজেরাই খদ্দর তৈরী করো। গ্রামবাসীরা তখন দারুণ ঋণগ্রস্ত। করাচি প্রস্তাব প্রতিশ্রুতি দেয়, কৃষিকার্য্যে ঋণের ছাড় দেওয়া হবে আর তেজারতি ব্যবসা দখলে আনা হবে। 1931 সালে ভারতবাসীর আয়ুসীমা ছিল মাত্র 24 বছর। ব্রিটেনে তখন জনস্বাস্থ্যে বছরে জনপ্রতি ছয় টাকা হারে খরচ হ'তো, সে জায়গায় ভারতে ছিল মাথাপিছু মাত্র তিন আনা খরচ। বেশীর ভাগই খরচ হোত সামরিক খাতে, জনস্বাস্থ্যের জন্য

ছিল সামান্য। এই থেকেই বোঝা যায় সামরিক বিভাগ এবং রাজকীয় চাকরী জাতীয়করণে ভারতবর্ষ কেন এতো জোরদার দাবী জানায়। 1931 সালে মাত্র শতকরা 8·1 ভাগ লোক লেখাপড়া জানতো। ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ এটাই সবচেয়ে বড় অভিযোগ—দেড়শ বছর রাজত্ব করার পরও এই ব্যাপক নিরক্ষরতা। কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেই গ্রামীণ উন্নতি, কুটির শিল্পের বিকাশ ও ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোরদার অভিযান চালায়।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে হরেন্দ্রকুমার বলেন, 'ভারতের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক—আজও আমাদের প্রায় ষাট কোটি মানুষ পুরনো সামাজিক আর ধর্মীয় বিচার অনুসারে শতাব্দী ধরে মনুষ্যত্বের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদের উন্নতিতে খৃষ্টান মিশনারীদেরই প্রথম পদক্ষেপ। এই সমগ্র গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য মিশনারীরা খেটে কাজ করে প্রচুর লোককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। পরবর্ত্তীকালে আর্য্য সমাজ তাদের 'শুদ্ধি' করে সভ্য করে নিয়েছে। শিক্ষিত হিন্দুরা এদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি 'অন্ত্যজ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছে।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার এদের ভোটাধিকার দেয়। আর রাজনীতিকরাও এদের স্থান দেয়। উত্তর ভারতে বেশীর ভাগ লোকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণে কিন্তু বিপুলসংখ্যক জনগণ খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়, সবাই তা দেখে আতঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। তখন আইন করে অস্পৃশ্যতা বন্ধ করতে হয়। তখন থেকেই হরিজনরা নিজেদের শক্তি বুঝতে শুরু করলো। সংঘ গড়তে লাগলো। পরামর্শ-সভা ডেকে বর্ণ-বিদ্বেষ বন্ধ করার দাবী জানায়। ক্রমে এক সময় এরা সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে, যেমন, ভাইকোমে এরা স্থানীয় মন্দিরে জোর করে ঢুকতে চেয়েছিল।

'সব কৃতিত্বই কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর প্রাপ্য। কারণ, ভারতবর্ষের নেতাদের মধ্যে তিনিই অচ্ছুৎ সমস্যার সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। এই সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন।' প্রকৃতপক্ষে জনগণের মধ্যে তখনও জাগরণ দেখা দেয়নি। গান্ধীজীর আমরণ অনশন পণ মানুষকে জাগিয়ে তোলে। তার আগে অবধি সাধারণের মধ্যে এর প্রকৃত প্রভাব দেখা যায়নি। জাগরণের ফলে 1932 সালে হরিজনরা

রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায় আর মানুষের মধ্যে একটা অন্যায়বোধ জেগে উঠে। গান্ধীজীর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। ত্রিবাঙ্কুর আর অন্যান্য রাজ্য আইন করে সকল জাতির জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেয়। হিন্দু চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাস করা হ'ল। কংগ্রেস মাদ্রাজে অসামরিক অযোগ্যতা দূরীকরণ আইন প্রণয়ণ করে। এই আইনে বলা হয়: কোন 'অচ্ছুৎ' সাধারণ নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হবে না। সাধারণের ব্যবহার্য্য নদী, কুয়ো, জলাধার, পুকুর, রাস্তা, স্নানাগার, সর্বপ্রকার যানবাহন আর ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে এদের আর পাঁচজনের মত সুবিধা ভোগের অধিকার থাকবে।

'মালাবার মন্দির-প্রবেশ আইনও তখন গৃহীত হয়। 1934 সালের জুলাই মাসে, আইন করে তাঞ্জোরের সব চেয়ে বিখ্যাত মন্দির এবং অন্যান্য নব্বুইটি মন্দিরের দরজা অচ্ছুৎদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তাঞ্জোরের যুবরাজ এই আইনটি প্রণয়ন করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ইনি মন্দিরের সেবাইতদের একজন ছিলেন।

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সরকার দক্ষিণের উদাহরণ অনুসরণ করে। 'কংগ্রেস যদি তখন সরকার ছেড়ে না দিত, তাহলে সব কংগ্রেস রাজ্যের মন্ত্রিসভা একই ব্যবস্থা নিতে যে পারতো, এ বিষয় কোন সন্দেহই ছিল না।' কংগ্রেসীদের প্রচেষ্টায় হরিজন সেবক সংঘ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কাজ করতে শুরু করেছিল।

সাধারণের দুঃখ দূর করার জন্য কংগ্রেস মাদক দ্রব্য এবং ঐ সম্বন্ধীয় বস্তু বর্জনে জোর দেয়। এতে কিন্তু আর্থিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। হরেন্দ্রকুমার বলেছিলেন, 'লজ্জাঘৃণার সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আসলে আমরা সবাই আত্মকেন্দ্রিক। এই প্রচলিত অপবাদ সহজে খণ্ডন করা যাবে না। সব সময় নিজেদের স্বার্থই প্রথম আসে। কংগ্রেস জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কাজ করতে চেষ্টা করে, পাহাড়ী অধিবাসী আর হরিজনদের উন্নতিকল্পে কাজ করে—কংগ্রেসই একমাত্র মানব প্রেমী প্রতিষ্ঠান।' বিনা দ্বিধায় কংগ্রেস অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। কংগ্রেসের বাইরের ধনী সম্প্রদায় কিন্তু সহযোগিতা করেনি। তখন এক নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। তখন নতুন কর আরোপ করা হয় এবং 1935 সালে ভারত সরকার আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে রাজস্বের জন্য কয়েকটি করের ওপর নির্ভর-

শীল হতে হয়। শুল্কের আয় সরকারের ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়লো। প্রচণ্ড বিরোধীতা সত্ত্বেও কংগ্রেস অবশ্য তখন মাদকদ্রব্য বর্জন অভিযান শুরু ক'রে, বিকল্প কর আরোপ করে।

এক সময় এক ইংরেজ মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতের দাবী ভোটের নয়, দাবী ভাতের।' এই মন্তব্য সমর্থন করে হরেনবাবু বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ একটু জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দাবী জানিয়েছিল ব'লেই গত নির্বাচনে কংগ্রেস চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে বলা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা, দাদাভাই নৌরজী সেই কংগ্রেসে স্বরাজের আদর্শ তুলে ধরেন আর গান্ধীজী আনেন জনসাধারণকে—সেই কংগ্রেসে, সেই আদর্শে। তিনি এতদিনের অজ্ঞাত, কিংবা জানা থাকলেও যা স্বীকৃতি পায়নি সেই ভাবধারার প্রতিমূর্তি ছিলেন। এই ভাবাদর্শ ছিল, দেশের দরিদ্রতম মানুষটির জন্যও আর্থিক ও সামাজিক ন্যায় অর্জন করা।

কংগ্রেস একটি জোরদার কৃষি-কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কিন্তু এই কর্মসূচি কোনদিক দিয়েই সু-কর্মসূচি ছিল না। আসলে তখন প্রয়োজন ছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার। তাই গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেস জমিদারদের 'গুরুভার করের সুযোগ, চারিদিকের বুভুক্ষা, নগ্নতা, ঋণগ্রস্ততা, বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা, কৃষি সবকিছুই তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—'দেশে যদি একটা কুকুরও খালি পেটে থাকে, তো তাকে খাওয়ানোই আমার ধর্ম।' গান্ধীজী আর কংগ্রেস এই বাণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা আদর্শ হিসেবেই গ্রহণ করেন নি – তাঁরা এই বাণীর বাস্তবরূপ দিয়েছেন।

কুটীর শিল্প স্থাপন আর বেকারত্ব দূরীকরণে কংগ্রেস সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বেকারত্ব দূরীকরণে গান্ধীবাদী সমাধান হোল—'বেশীর ভাগ লোকই কৃষক। ভারতীয় কৃষিকার্য্যে এরা জড়িত। এই কাজে নির্দিষ্ট অল্প সময় কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর বছরের বাকি সময়টা কিছুই করার থাকে না। বেশীর ভাগ লোকই এই সময়টা কুঁড়েমি করে কাটায়। কিন্তু এই সময় যদি কৃষকরা কারিগরী শিল্পকর্ম করে তো নিজেরা আর পরিবারের সবাই কাজ পায়। ক্ষেতে যখন কিছু করার থাকবে না, তখন তারা এই কাজ করতে পারে। অথচ

কারিগরী শিল্পে লাগাতার পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। এই ভাবে চলতে পারলে বাজে সময়ের সদ্‌ব্যবহার হবে। তাই এই পরিকল্পনা, দেখা গেছে, যথেষ্ট লাভদায়ক। কুটীর শিল্পের মধ্যে সব চেয়ে চালু আর আদর্শ শিল্প হোল, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে বাড়ীতে তাঁতের কাপড় বোনা।'

গান্ধীজী কৃষি ও কারিগরী শিল্পের সমন্বয় করে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র জনগণকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দেন। বেকারত্ব দূরীকরণে এধরনের নানা পন্থা আর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কুটীর শিল্প বাঁচানোর কথাও বলা হয়। হরেনবাবু দেখেন, প্রচুর খৃষ্টান গ্রামে অভাবে দিন কাটাচ্ছে। 'অ-খৃষ্টান গ্রামবাসীদের উপকারের জন্যে যে কুটীর শিল্পকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, গ্রামীন খৃষ্টানরাও এতে উপকৃত হবে।' অ-কংগ্রেস এলাকার চেয়ে কংগ্রেস এলাকাতেই খৃষ্টানদের স্বার্থ বেশী করে দেখা হোত। তিনি সব অঞ্চলেরই কুটীর শিল্পের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা দেন।

'একথা সত্যি যে নানা জায়গায় বৃহদায়তন উৎপাদন আর উৎপাদন শিল্পের বন্দোবস্ত করতে হবে। সে আমাদের মনপসন্দ হোক বা নাই হোক। কিন্তু মানুষ আর যন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে, যে সব শিল্পে বেশী লোক দরকার সেখানে বেশী চাকরী দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেই হবে। হয়তো গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কাজটা খুব একটা উচিত হবে না। কিন্তু দেশের নেতার দৃষ্টিতে—যিনি জনগণের উন্নতি করাকে কর্তব্য মনে করেন এবং তা করার সুযোগে গর্বিত বোধ করেন—তাঁর দৃষ্টিতে এটা সঠিক বলে মনে হয়। এই কাজে আমাদের কুটীর শিল্প রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এবং আমাদের গরীব ভাই-বোনদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই পথ বেছে নিতে কোন রকম দ্বিধার সম্মুখীন হওয়া উচিত হবে না।

'একথা মানতেই হবে, অন্ততঃ প্রথম দিকে, কুটীর শিল্পের স্বার্থে ক্রেতাদের ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করতে হবে। কিন্তু এটা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। কুটীর শিল্পে সস্তায় বিদ্যুৎ পেলে উৎপাদনের খরচ নিশ্চয় কমবে। সারা ভারতে কুটীর শিল্প চালু হলে, আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে আর তাতে পাইকারী দামও কমে যাবে।'

'এই তো সেদিন, বিয়াত্রিচ আর সিডনি ওয়েভ সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে কাজ করার সময় মন্তব্য করেন, সে দেশে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও ঐ দেশের অর্দ্ধেক আভ্যন্তরীণ চাহিদা কুটীর শিল্প থেকে মেটে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মিলিত সংস্থা বা সমবায় প্রথার জন্যই এটা সম্ভব। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবিকতা যথেষ্ট দামী। কোন ভারতবাসী বা দেশপ্রেমীরই বেশী দামে জিনিস কিনতে গায়ে লাগবে না, কারণ সে জানবে এই অর্থ তারই দেশের ভাইবোনদের ক্ষুধা, নগ্নতা, রোগ আর অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে।'

'কংগ্রেস ও জনগণ' নামক বইটিতে আরেকটি বিষয় আলোচিত হয়—কংগ্রেস আর শ্রমজীবি। জহরলাল নেহেরুর 'এইট্টীন মানথস ইন ইণ্ডিয়া' (ভারতে আঠার মাস) থেকে উদ্ধৃত করে হরেনবাবু বলেন, 'নিঃসন্দেহে কংগ্রেসই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় জনসংগঠন। জনগণের সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ। আর সেইজন্যেই কংগ্রেস এদের অর্থনৈতিক সমস্যা আর অপটুতা নিয়ে মাথা ঘামায়। এরা হোল কৃষক শ্রমিক এবং অন্যরা।'

'উদার সেবার নমুনা আর ত্যাগের ফলেই এতটা সম্ভব। এছাড়া ছিল জনগণের প্রতি সরাসরি আবেদন আর তাদের অর্থনৈতিক পটভূমিকার বিন্যাস। খাঁটী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে সাধারণ মানুষ এটাই ভাল বুঝতো।'

কংগ্রেসের সমর্থনে কিষাণ আন্দোলন প্রেরণা পায়। 'গান্ধীজীই নেতৃত্ব দেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। বিহারের চাম্পারন আর গুজরাটের বরদলুই ভারতীয় কৃষকের হৃদয় জয় করে। কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে আজও দুর্ভাগ্য কবলিত একটিও কৃষক পাওয়া ভার। ঠিকমত সংগঠিত হবার পর কৃষকরা নিজেদের ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে। কংগ্রেস শিল্প শ্রমিকদের বিষয়েও বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাঁদের ইস্তাহারে বলা হ'য়েছে : শিল্প শ্রমিকদের জন্য কংগ্রেসের পরিকল্পনা হোল—এদের থাকার ভাল বন্দোবস্ত, কাজের সময় নির্ধারণ এবং শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ...শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে যাতে বিবাদ না হয়, তার জন্যে উপযুক্ত কমিটি গঠন, বার্দ্ধক্যে আর্থিক সংরক্ষণ, অসুস্থতা, বেকারত্ব এবং নিজেদের স্বার্থে হরতাল করার অধিকার।'

1936 সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু কৃষক সংগঠনের শ্রমিক সংঘকে আমন্ত্রণ করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে এরা কংগ্রেসের সহযোগিতা করবে এই আশায়। হরেনবাবু কিন্তু মনে করেন, প্রথম দিকে কংগ্রেস কম্যুনিজমের দারুণ বিরোধিতা করেছিল, যদিও দেশের জনগণের প্রতি এদের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

এই বইটির শেষ পরিচ্ছেদে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আর জন জাগরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

হরেন্দ্রকুমার বলেন, 'উঁচু শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও, বিশেষতঃ দিনের বেলায় তৃতীয় শ্রেণীতে করে ঘন্টার পর ঘন্টা দেশের নানা জায়গায় কত ঘুরেছি। শুধু মজাই পাইনি, সঞ্চয় করেছি অভিজ্ঞতাও। ট্রেনে যেতে যেতে সারাদিন ধরে লোকেরা নানা সমস্যার কথা আলোচনা করতো। কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতে আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে এদের কি ধারণা, তা বুঝতে পারতুম। রাজনীতি নিয়েই সাধারণতঃ আলাপ আলোচনা চলতো। কেউ কেউ বড় ষ্টেশনে যে কোন ভারতীয় ভাষায় একখানা খবরের কাগজ কিনতো, এর পরই শুরু হোত রাজনীতি। কেউ একজন কাগজটা কিনেই একবার চোখ বুলিয়ে নিতো। আর তারপরই কাগজটি হাতে হাতে চলতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী বা অন্যান্য বড় বড় নেতা যেমন, জহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাস বোস বা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তব্যের কলমটা পড়ার জন্যই এত ব্যস্ততা। জিন্নাহ, স্যার সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, সাভারকর, মুন্জিরের বক্তব্যও তারা পড়ত এবং প্রাদেশিক সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা নিয়েও আলোচনার ঝড় বইত। কয়েক বছর আগে কোথাও এক জায়গায় আমি পড়েছিলুম—প্রত্যেক বছর ভারতীয় রেল সংস্থার প্রায় সাতশো পঞ্চাশ কোটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রী হয়। এ কথা যদি সত্যি হয় তো কি ভাবে রেলের মাধ্যমে চিন্তাধারার আদান প্রদান করা যায় সেই সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

তারপর ক্রমে গাড়ী, বাস। চলচ্চিত্র আর রেডিও, মাতৃভাষার সাময়িক পত্রিকা। খৃষ্টান মিশনারীদের কাজকর্ম, ভোটাধিকার বাড়ান ইত্যাদি বিষয়ে, গান্ধীজীর প্রসঙ্গ না আসা অবধি আলোচনা চলতে থাকে। এই নামটি যেন এদেরই পরিবার ভুক্ত। ইনি কৃষক, শ্রমিক এমনকি অচ্ছ্যুৎ প্রেমীও ছিলেন। গান্ধীজী কবেই এদের ভালবেসে

বসে আছেন। 'এবং তিনি করেছিলেন যখন কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি যে, একদিন এই গভীর আর অচ্ছ্যুৎদের সাহায্যই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হবে।

'...বিহারের চাম্পারন জেলায় শতাব্দী ধরে কৃষকরা মালিকের মুনাফার জন্য নীলের চাষ করতে বাধ্য হোত। মাহাত্মা গান্ধী কি ভাবে সংগ্রাম করে এই অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্ত করেন, এ কাহিনী তারা সবাই শুনেছিল। গুজরাটের কয়রা জেলায় গান্ধীজী কৃষকদের ওপর অন্যায় ভাবে চাপানো বাড়তি রাজস্ব সরকারকে সংশোধন করতে বাধ্য করেন।'

ভূমিকর পুনসংশোধন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে 1926 সালে গান্ধীজী বরদলুই সত্যাগ্রহ শুরু করেন। সেখানে শতকরা ত্রিশ ভাগ কর বেড়েছিল। আন্দোলনের পর কিন্তু কমে তা শতকরা 22 ভাগে দাঁড়ায়। তাও যথেষ্ট বেশী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। সংবিধান আন্দোলন সফল না হওয়াতে কৃষক সভা স্থির করে যতক্ষণ না নিরপেক্ষ বিচার সভা বসছে বা করের হার কমানো হচ্ছে ততক্ষণ কোন কর দেওয়া হবে না। ফলস্বরূপ মিলল, জেল। জায়গা-জমি বাজেয়াপ্ত আর নানারকম অত্যাচার। কিন্তু কোন ফল হোল না। অবশেষে তদন্ত কমিটি বসল। নির্ধারিত করের হার বেশ খানিকটা কমে গেল। পাঞ্জাব আর মধ্যপ্রদেশেও এই 'কর নয়' আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। এই জয়ের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল— কৃষকদের নতুন মর্য্যাদাবোধ।

কারখানার শ্রমিকদের কথা ধরলে—মহাত্মা গান্ধী শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থে আহমেদাবাদে সফল প্রচারকার্য্য চালান। বিহারের বিরাট এলাকা জুড়ে আর্থিক দুরাবস্থা আর প্রকৃত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গান্ধীজীই তখন বৃহদায়তন ত্রাণ কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। তাঁর হরিজন-প্রেম এবং এদের জন্য তাঁর কাজকর্ম সুবিদিত। জনগণকে শোষণ করা গান্ধীজী ঘৃণার চোখে দেখতেন। প্রায়ই তিনি একইভাবে ইংরেজ শাসক, ভারতবর্ষের জমিদার শ্রেণী আর শ্রমিকদের বড় বড় নিয়োগ কর্তাদের বিরুদ্ধে একই বলিষ্ঠ সংগ্রাম চালিয়ে যান আর সমানভাবে জয়ী হন। তাঁর আরেকটি লক্ষ্য ছিল—প্রত্যেকে, এমনকি গরীবতম মানুষটিও সমান অধিকার পাবে। তাঁর নেতৃত্ব আর অনুপ্রেরণায়

এবার তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। সহযোগিতা আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মূল্য তারা বুঝতে শিখেছিল। চাকরের মত ঘাড় হেঁট করা ভুলে গিয়ে, নতুন আত্মমর্য্যাদায় মেরুদণ্ড সোজা করে আজ এরা দাঁড়াতে শিখেছে। তারা বুঝতে পারলো ঐক্যই বল। গরীব আর সাদাসিধে হলেও তারা তখন থেকে সাদা চামড়ার সাহেবই হোক বা গণ্যমান্য দেশী কর্মকর্তা কিংবা জমিদার বা মহাজন হোক—তাদের চোখে চোখ রাখতে তারা জানলো।

পরিশেষে হরেনবাবু বলেন : 'আমি অখিল ভারতীয় খৃষ্টান পরিষদের সাধারণ সাংগঠনিক সচিব এবং সভাপতি থাকাকালীন দেশের নানা জায়গায় প্রচুর ঘুরেছি। কোথাও বড়লোকের অতিথি, আবার কখনো মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের সঙ্গেও থেকেছি। মাঝে মাঝে একেবারে মাঠে চাষ করা চাষী বা মেসিন চালানো শ্রমিকদের সঙ্গেও কাটিয়েছি। এই সময় লক্ষ লক্ষ ভাইবোনেদের দেখে বার বার আমি দুঃখ পেয়েছি। কোঠরাগত চোখ, কৃশ দেহ আর অসহায় চাউনি দেখে মনে হয়েছিল, এরা যেন সব আশা ভরসা হারিয়ে বসেছে। অন্ধ্র আর উৎকলের বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা পেটভরে খেতে না পেয়ে বার্দ্ধক্যে যেন নুয়ে পড়েছে। কিন্তু জনগণ এবার জেগেছে, এদের এখন পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটা এখন একান্ত জরুরী যে ভারতবাসীর কাওকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের হাল ধরতে হবে। গান্ধীজীর আরো সেনাপতির প্রয়োজন। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু, এখনো তারা যে কাজ মন্ত্রী থাকাকালীন শুরু করেছিল সে সব ভালমতই করে যাচ্ছেন। এই সম্বন্ধে আগে অপর্য্যাপ্ত আর খুবই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এদের এখন নিঃস্বার্থ কর্মীর প্রয়োজন। মাতৃভূমির কাজে প্রত্যেকের সাহায্য আর সহযোগিতার প্রয়োজন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজের পরিকল্পনায় আমাদের সকলের মাথা না ঘামালেও চলবে। কোন স্বদেশপ্রেমী ভারত সন্তান কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে সরে থাকতে পারে না।'

মৃত্যু আর দান

1956 সালের 7 আগষ্ট, উনআশি বছর বয়সে হরেনবাবু মারা যান। কিছুদিন ধরেই তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। 2 আগষ্ট অবস্থার অবনতি ঘটে! চিকিৎসক তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেন। কিন্তু, বিছানায় শুয়ে থাকা হরেনবাবু মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে এসে কাজ শুরু করেন। 7 আগষ্ট সকালে চা খেলেন। পড়ে যখন অফিসের কাগজপত্তর সই করছিলেন সেই সময় হঠাৎ বুকে দারুণ যন্ত্রণা বোধ করলেন। তখুনি ডাক্তার ডাকা হোল। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই হরেনবাবু অচেতন হয়ে পড়লেন এবং শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ যেন এক মহাপ্রয়াণ। এক জীবনীকার মন্তব্য করেন—'তিনি বেশী ভুগলেন না। কাজ করতে করতেই চলে গেলেন। আর্ত, দরিদ্রের সেবা—যা ছিল তাঁর দরদপ্রিয় সেই কাজের মধ্যেই নিয়োজিত থাকার সময় চলে গেলেন। তখন তিনি যক্ষ্মা কলোনীর কাগজপত্তর সই করছিলেন।'

এই মহাপ্রয়াণে সারা দেশবাসী শোকমগ্ন হ'য়ে পড়ল। দেশের সব শ্রেণীর, সব ধর্মের আর প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মানুষ হ'য়ে পড়লেন শোকাহত। আর পশ্চিমবঙ্গের জনগণের তো কথাই নেই। মনে হোল যেন তাদেরই পরিবারের একজনকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

হরেনবাবুর মরদেহ তিনদিন সরকারী শোক ব্যবস্থায় রাখা হয়। হাজার হাজার নরনারী তাদের প্রিয় রাজ্যপালকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে। বিধান রায়ের নেতৃত্বে শোকযাত্রা শুরু হয়, তখন তিনি শোকসন্তপ্ত সদ্য বিধবা বঙ্গবালাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিস্থলে। হরেনবাবুর ইচ্ছানুসারে ছেলের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

চারিদিক থেকে অগণিত শোকবার্তা আসে। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর শোকবার্তায় বলেছিলেন : 'হরেন্দ্রকুমার জনগণের মহান সেবক আর

আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন।' হরেনবাবুর বন্ধু বিধান রায় বলেছিলেন : 'হরেনবাবু দেশবাসীর সেবা করতে করতেই চলে গেলেন।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হরেনবাবুর দানে বিশেষ উপকৃত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় এক শোকসভার আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নির্মল সিদ্ধান্ত বলেছিলেন : 'ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে হরেনবাবু এক অসাধারণ মানুষ ছিলেন।'

ওই 7 আগষ্টের দিন রবীন্দ্র তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে নিমতলা ঘাটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সেবার এই অনুষ্ঠানে হরেন-বাবুরই কবির স্মৃতিমন্দিরে পুষ্পমাল্য অর্পন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না বলে এক বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বার্তায় দান এবং সেবার লক্ষ্যকে তিনি তুলে ধরেন। হরেনবাবুর দান অঙ্কের হিসেবে বিশ লাখ টাকার অনেক বেশী ছিল।

হরেনবাবু প্রথম দান করেছিলেন পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে, 1932 সালে। এই তহবিলের নাম রাখা হয় 'লালচাঁদ মুখোপাধ্যায় তহবিল।' এই তহবিল, বিদেশে গিয়ে সুতো কাটা, তাঁত বোনা আর কাপড়ে রং করা শেখার জন্য বৃত্তি দেবে। তাঁর দ্বিতীয় দানটি মায়ের নামে। উদ্দেশ্য একই, বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া। তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম তহবিল তাঁর মা বাবার নামেই করা হয়, উদ্দেশ্য—উক্ত বিষয় ভারতবর্ষেই শিক্ষা দান। ষষ্ঠ তহবিলটি ছিল তাঁর স্ত্রী বঙ্গবালা-দেবীর নামে। এই তহবিল দরিদ্র উপযুক্ত মহিলা ডাক্তারকে আর্থিক সহায়তা দেবে, যাতে তাঁরা সেই বিষয় বেশ ভাল করে আগা-গোড়া শিখতে পারেন। (তিনি ফ্লোরেন্স নাইটইংগেলের খুব ভক্ত ছিলেন)।

বেশীর ভাগ বৃত্তিগুলোই ছিল গরীব খৃষ্টান ছেলেদের জন্য। কারণ, তিনি মনে করেন, ব্রিটিশ রাজত্বে নিচুজাতের লোকেরাই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এদের কাছে লেখাপড়া ছিল গৌণ। এইজন্যেই এরা সমাজের অবহেলিত। যাই হোক, পরে অবশ্য তিনি শর্ত শিথিল করে যে কোন সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের নামে তা লিখে দেন। কেননা, তিনি জানতেন ভারত সরকার স্বাধীনতার পর সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার আর যথাযথ ব্যবহার করবে। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করার বিষয়ে যে সংবিধান, হরেন-বাবুই তা অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

সৎ আর উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলাই এইসব বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হরেনবাবুর শিক্ষায়াতনের আদর্শ—শিক্ষার অগ্রগতি। একজন সামান্য স্কুল মাষ্টার হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি 22 লাখ টাকা দান করে গেছেন। এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। সারা ভারতে হয়তো এর তুলনা নেই।

সমালোচকরা মন্তব্য করেন, হরেনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী বঙ্গবালাদেবী অর্থকষ্টে পড়েন। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র ও নির্দেশপত্র পড়লে বোঝা যায়, এ অভিযোগ সত্যি নয়। নিম্নোক্ত শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইলখানি পড়লে পাঠকরা হরেনবাবু কিভাবে বিভিন্ন সংস্থায় দান করেন, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

হরেন্দ্রকুমারের শেষ উইল ও নির্দেশপত্র

'আমি হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পিতা স্বর্গীয় লালচাঁদ মুখার্জী, বিশ্বাসমতে খৃষ্টান, পেশা অবসরপ্রাপ্ত, সাং 2B, ডিহি শ্রীরামপুর রোড, থানা বেনিয়াপুকুর, কলিকাতা এতদ্বারা আমার শেষ উইল ও নির্দেশাদি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

1. এরদ্বারা আমি আমার কলিকাতা সহরতলীর 1, 1/1, 2A, 2B, 2C, ডিহি শ্রীরামপুর রোডের বাড়ীগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লিখিয়া দিলাম। বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার মধুপুরের 'স্বস্তিকা' নামক বাড়ীটিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে। এই বিষয় 11 ও 12 নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাদি প্রযোজ্য হইবে। 2বি, ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীটির দ্বিতল ও মধুপুরের জমিজমা সমেত বাড়ীটি বিনাভাড়ায় ও বিনা পৌরকরে আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী জীবন সত্ত্ব ভোগ করিবে। তাঁহার মৃত্যুর পর 2বি ডিহি শ্রীরামপুরের উক্ত দ্বিতল ও মধুপুরের জমিজমা সহ 'স্বস্তিকা' নামক বাড়ীটি পুনরায় আমার সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে। যদি কোন কারণবশতঃ ইচ্ছাপত্রের অছি, নাম পরে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমার এই স্থাবর সম্পত্তি কদাপি বিক্রয় করিতে চাহেন, সেই ক্ষেত্রে আমার নির্দেশ রহিল, আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর স্বাক্ষর ব্যতীত উক্ত সম্পত্তি

বিক্রয় করা যাইবে না। আর যদি বিক্রয় করা হয়, সেইক্ষেত্রে আমার নির্দেশ, যতদিন আমার পত্নী জীবিত থাকিবেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জন্য মাসিক 100 টাকা হিসাবে বাড়ী ভাড়া দিবে। আমি আমার উইলের অছিবৃন্দকে এইরূপ নির্দেশ দিতেছি যে আমার উক্ত পত্নীর স্বাক্ষর ব্যতীত মধুপুরের সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে না।

2. এতদ্বারা আমি ঘোষণা করিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা 3% হারে সরকারী জামানতের (1896-97) সুদ সঞ্চয় করিতে থাকিবে। কেবল মাত্র 13 নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়, ইহার আওতায় পড়িবে না।

3. এতদ্বারা আমি আমার কুমিল্লা ব্যাংকের স্থায়ী আমানত আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর নামে লিখিয়া দিলাম।

4. এন্টালী ডাকঘরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, আমানত নং 783718, এই খাতে রাখা সমস্ত অর্থ আমার স্ত্রী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী পাইবেন।

5. এতদ্বারা আমি ঘোষণা করিলাম, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকে (কলিকাতা শাখা) আমার নামে চলতি আমানতের সকল অর্থ, আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী পাইবেন। আমানত নম্বরের উল্লেখ নাই।

6. এতদ্বারা আমি নির্দেশ দিলাম, আমার প্রাপ্য বকেয়া ভাতা আমার স্ত্রী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীকে দেওয়া হইবে।

7. এতদ্বারা আমি অছিবৃন্দকে নির্দেশ করিতেছি যে, আমার (ক) কাটাখাল লালবাজার রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড (খ) কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড এবং (গ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের অংশ কুমিল্লা ব্যাংকের সর্বময় নির্দেশকের সহযোগিতায় বা তাঁহার অবর্ত্তমানে, সরাসরি বিক্রয় করা যাইবে। বিক্রয়ের পর অর্ধাংশ আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী পাইবেন। আর বাকি অর্দ্ধেক সমান ভাগে ভাগ করিয়া আমার মৃত অগ্রজ অক্ষয়কুমার মুখার্জীর জীবিত পুত্র ও কন্যাদের দেওয়া হইবে।

8. এতদ্বারা আমি আমার সমস্ত পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে লিখিয়া দিলাম। আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পুস্তকগুলি অধিগ্রহণ করিবে।

9. এতদ্দ্বারা আমি লিখিয়া দিলাম, আমার অন্যান্য সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

10. এতদ্দ্বারা আমি নির্দেশ দিলাম, আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জী, আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং 77, আশুতোষ রোড, ভবানীপুর নিবাসী স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পুত্র, মাননীয় বিচারক শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ও শ্রী উমাপ্রসাদ মুখার্জী, এবং 26 হাজরা লেন, পোষ্ট : রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, টালিগঞ্জ, কলিকাতা নিবাসী স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ গুহরায়ের পুত্র শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় এবং 44এ, সৈয়দ আমীর আলি এ্যভিন্যু, পোষ্ট : পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জ কলিকাতা নিবাসী স্বর্গীয় এ্যান্টনী গোমেসের পুত্র মিঃ ড্যানিয়েল গোমেস এম. এল. এ. আমার শেষ ইচ্ছাপত্র ও ঘোষণা পত্রের ভারপ্রাপ্ত অছিবৃন্দ। সততা প্রমাণীকরণে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে ও উইলের বিষয়বস্তু কার্য্যকরী করিবার সমস্ত ব্যয়ভার আমার সম্পত্তির আয় হইতে বহন করা হইবে।

11. এতদ্দ্বারা আমি আমার অছিবৃন্দকে ওকালত নামা লিখিয়া দিতেছি, তাঁহারা আমার যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া, লভ্যাংশ ইত্যাদি আদায় করিবেন ও যাবতীয় পৌরকরাদি ও অন্যান্য দেয় দিবেন। উক্ত স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ আর মেরামতের যাবতীয় খরচ এই ইচ্ছাপত্রের অছিবৃন্দ দিবেন। আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীকে মাসিক 100 টাকা বাড়ী ভাড়া হিসাবে দিতে হইবে। যদি তাঁহার জীবদ্দশায় 2বি ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীটি তাঁহারই লিখিত অনুমতিক্রমে বিক্রয় করা হয় বা সরকার, রেল কোম্পানী বা যে কোন বেসরকারী সংস্থা দ্বারা উক্ত সম্পত্তি সময়োচিত প্রচলিত আইন দ্বারা বিধিসম্মত ভাবে জমিজমা বা সম্পত্তি গ্রহণ অথবা দখলের আওতায় আসে তাহা হইলে, ইহা আমার আদেশ নহে, কিন্তু আমার ইচ্ছা, মধুপুরের জমিজমা সমেত 'স্বস্তিকা' নামক বাড়ীটি আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর অবর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন বিক্রয় করিয়া না দেয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ-মুসলমান কর্মচারী, যাহাদের বেতন 200 (দুইশত) টাকার কম, তাহারা হাওয়া বদল করিবার জন্য বিনা ভাড়ায় উক্ত বাড়ীটিতে থাকিতে পারিবে। কিন্তু একযোগে তিন মাসের অধিক নয়—বা কোন সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত লোক,

যাহার উপস্থিতিতে বাড়ীটি এবং সংলগ্ন এলাকা দূষিত হইতে পারে, এইরূপ কোন ব্যক্তি থাকিতে পারিবে না।

12. এতদ্বারা আমি আমার উক্ত উইলের অছিবৃন্দকে নির্দেশ করিতেছি যে, আমার কলিকাতাস্থ এবং মধুপুরস্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের অর্থ হইতে 25,000 (পঁচিশ হাজার) টাকা বাঙলার শ্রীরামপুর কলেজের কর্মকর্তাদের দেওয়া হইবে। তাঁহারা এই টাকা 'লালচাঁদ মুখার্জী ট্রাষ্ট ফাণ্ডে' জমা করিবে। উক্ত ট্রাষ্ট ফাণ্ডে আমি ইতিমধ্যে কিছু দিয়াছি। আমি জীবদ্দশায় যদি উক্ত 25,000 (পঁচিশ হাজার) টাকা পুরন করিয়া দিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর উক্ত ফাণ্ডের জন্য অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই। সেই ক্ষেত্রে উক্ত অছিবৃন্দরা আমার অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভাগ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সকল বৃত্তি আমি ইতিমধ্যে চালু করিয়াছি, সেই খাতে জমা করিবেন। অতএব, সরকারী জামানতের শতকরা তিন ভাগে প্রত্যেক বৃত্তির অঙ্ক অন্ততঃ এক লক্ষ টাকার কম হইবে না। ইহার পরেও যদি কিছু অর্থ বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে সেই অর্থ সমান অংশে উক্ত বৃত্তিগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সকল অস্থাবর সম্পত্তির আংশিক বা পূর্ণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী জামানতে জমা হইবে। ইহার সুদ হইতে বিভিন্ন বৃত্তিগুলি দেওয়া হইবে।

13. এতদ্বারা আমি এই লিপিবদ্ধ বিবরণ পেশ করিলাম—কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকে (কলিকাতা) শতকরা 3% টাকা হারে সরকারী জামানতে আমি যাহা জমা রাখিয়াছি, তাহার মোট মূল্য 14,500 (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা, ইহা আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি নিজের উপার্জন হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন এবং সুদ পাইবার জন্য উক্ত ব্যাংকে জমা করা হইয়াছে। অতএব উক্ত ব্যাংকে আমার নিজস্ব আমানতের অধিক মূল্যায়ন যেন না হয়। সেই কারণে, আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি, উক্ত জামানত আমার স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি, আমার সম্পত্তির সহিত তাহার কোনরূপ যোগাযোগ নাই। আমার উক্ত ধর্মপত্নী কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংকে তাঁহার নিজস্ব নামে আরো কয়েকটি অংশ রাখিয়াছেন।

অতএব, আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি, উক্ত সম্পত্তিগুলি তাঁহার নিজস্ব, আমার সম্পত্তির সহিত কোনরূপ যোগাযোগ নাই। আমার অবর্ত্তমানে আমার এই উইলের উক্ত অছিবৃন্দ উক্ত সম্পত্তিগুলি আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর নামে করাইয়া দিবেন। আমার অবর্ত্তমানে এমন কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যদি দেখা যায়, যাহা ভুল বা অসাবধানতাবশতঃ এই উইলের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেইরূপ সম্পত্তিগুলি আমার স্ত্রীর সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে। এইরূপ সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার, স্বত্ব বা সম্বন্ধ ছিল না বা থাকিবে না। অতীতে যদি বা থাকিয়া থাকে, বর্ত্তমানে আমি সমস্তই আমার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জীর নামে লিখিয়া দিলাম।

(স্বাক্ষর) হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী
25 সেপ্টেম্বর, 1950

আদর্শবাদী ও সংস্কারক

ডঃ রাধাকৃষ্ণ এক সময় জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র কূটনীতিবিদ, যিনি রাজনীতিতে আদর্শবাদ, নৈতিকবোধ আর আধ্যাত্মবাদ প্রত্যক্ষভাবে আনেন। জীবনের উচ্চতর প্রকৃত সেবা বলতে আমরা যা বুঝি রাজনীতিকে ইনি সেই স্তরে নিয়ে যান। সাধারণতঃ সকলের ধারণা, রাজনীতি মানেই নোংরামি। তথা-কথিত রাজনীতি থেকে তাই অনেক আদর্শবাদী, মহৎ ব্যক্তি আর গুরুরা সরে থাকতেন। গান্ধীজীই প্রথম প্রমাণ করেন, পূর্ণ আদর্শবাদের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক নেতৃত্ব করা যায়। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশের সঙ্গে নেতৃত্বের সমন্বয় আনেন। একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। আত্মত্যাগ, নিরভিমানতা সর্বোপরি নীতি এবং অনুশীলন মন্ত্র দ্বারাই বিশ্বাস অর্জন করা যায়।

হরেনবাবু কখনোই সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তথাপি কংগ্রেস এই মানুষটির পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা পেত। ইনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহের গোঁড়া শিষ্য ছিলেন। প্রকৃত নিরভিমান ও আত্মত্যাগী পুরুষ ছিলেন। জীবনের সমস্ত কাজেই তিনি নৈতিক ভব্যতা এনেছিলেন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য হরেন্দ্রকুমারের জীবনের অন্য আদর্শগুলোর মধ্যে একটি। তিনি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সভ্য ছিলেন, সেটি ছোট হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্প্রদায়ের নেতারূপে তিনি সব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্রজাতির কল্যাণে কাজ করতে শেখাবার চেষ্টা করেন। খৃষ্টান হয়ে জন্মালেও, শুধু এদের মধ্যেই তিনি একতা জাগান নি, সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও মিলিত করেছেন। অখিল ভারতীয় খৃষ্টান পরিষদের সভাপতি আর সাধারণ সাংগঠনিক অধ্যক্ষ থাকাকালীন দেশের চারদিকে তাঁকে ঘুরতে হয়। হরেন-বাবুর নেতৃত্বেই ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তিনি বাংলার ভারতীয় খৃষ্টান সমিতি আর

কলকাতা মফঃস্বল ব্যাপটিষ্ট দলের সভাপতি ছিলেন। এই সময় ঐ রাজ্যের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি করেন। মুক্তি আন্দোলনে এদের শান্তিপূর্ণ সক্রিয় যোদ্ধা হতে শেখান। গণপরিষদে সহ-সভাপতি থাকাকালীন সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের সারা ভারতের সঙ্গে একাত্ম করার কাজে হরেনবাবুই ছিলেন যন্ত্রী। এই কারণে, তারা পরে লোকসভায় ও বিধানসভায় কোন সাম্প্রদায়িক আসন সংরক্ষণের দাবী করেননি। 1947 সালের মে মাসে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সংবিধান সভায় সংখ্যালঘু সম্পর্কিত মন্ত্রণা সমিতির বিবরণ পেশ করলে হরেন্দ্রকুমার বলেন, 'একটি দেশ কখনো কোন বিশেষ দলের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং উদারতার ওপর জোর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন বা নির্বাচন প্রতিযোগিতা চালাতে পারে না—দলীয় স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ শ্রেয়।' কিন্তু সংখ্যালঘু উপ-সমিতির সভাপতি থাকাকালীন তিনি বুঝতে পারেন যে শান্তির জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ-অগ্রগতির জন্য সংখ্যালঘুদের ইচ্ছাপুরণ করতে প্রতি পদক্ষেপে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের ওপর সবাইকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। তিনি বলেছিলেন : 'একবার যদি ধর্ম, সংস্কৃতি আর শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের প্রাথমিক অধিকারের নিশ্চয়তা গ্রাহ্য হয়, তাহলে আর কোন একটি গোষ্ঠীর অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা কি ? তফশীলজাতিকেও আর আলাদা সত্ত্বারূপে প্রতিনিধিত্ব করতে হয় না। নেতাদের পাণ্ডিত্য আমি নতমস্তকে সমর্থন করি। আমি মনে করি, সংখ্যালঘুরা আমাদের দেশে বিদেশীও নয়, বা তাদের স্বার্থ স্বদেশ বহির্ভূতও নয়।'

1939 সালে হরেন্দ্রকুমার নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মেলনের সভাপতি হন। তিনি ঘোষণা করেন, 'প্রোটেষ্টান্ট্ বা ক্যাথলিক যেই হোক না কেন, সকল ভারতীয় খৃষ্টানরা এক হয়ে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দে করে। তবে ইংরেজ রাজত্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের চেয়ে অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা বেশী সুযোগ সুবিধে পেতো বলে তিনি মনে করেন। নীতিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করলেও 1939 সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় খৃষ্টান পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে স্থির হয়, আলাদা আলাদা নির্বাচক মণ্ডলী চালু হলে, ভারতীয় খৃষ্টানদের দাবী দাওয়া স্বীকৃতি পাবে। 1932 সালে

সাম্প্রদায়িক বিচার ব্যবস্থা চালু হয়। এর প্রতিবাদে স্বয়ং গান্ধীজী অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন করেন।'

শুধুই ভারতীয় খৃষ্টানদের বৃত্তি দিলেন কেন? অনেকে হরেনবাবুকে এ প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িকতার অনুশীলন করেছেন। কারণ, নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি তাঁর ঠিক মনে ধরছিল না, আর সেই কারণেই বৃত্তির সুযোগ খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সাম্প্রদায়িক সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর এ এক সৎ প্রচেষ্টা হলেও, যেন মনে লাগে না। হরেনবাবু ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে সাম্প্রদায়িক ফারাক দূর হয়ে যাবে। আগেকার উক্তি অনুযায়ী তিনি 1954 সালে বৃত্তির বিধিনিষেধ তুলে নিয়ে, নতুন করে লেখেন: 'ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ছাত্রটির (বৃত্তিপ্রাপ্ত) মাতৃভাষা বাংলা, ভারতীয় নাগরিক এবং বাঙালী পিতামাতার সন্তান হওয়া চাই।' অতএব, হরেনবাবুর যদি কখনো কোন সাম্প্রদায়িক দুর্বলতা থেকে থাকে তো, সে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার আগে, ইংরেজ যখন সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মদত জোগাত। হরেনবাবু যীশুকে 'আমার গুরু' 'আমার প্রভু' বলতেন, আর তাঁকে সবাই বলতো 'খৃষ্টানদের খৃষ্টান বটে।'

হরেনবাবু উপলব্ধি করেন, দেশের কাজ ইংরেজরা প্রশংসনীয়ভাবে সম্পাদন করেছে। তাঁর মতে এঁরা উচ্চ শিক্ষিত এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। ভারতীয় দাতব্য সংস্থায় বিদেশী টাকা লাগানো হয়েছিল। প্রোটেষ্টান্ট গোষ্ঠী একলাই 17,000 হাজার হিতকর সংস্থা চালাতো। বছরে দু' কোটী নব্বই লক্ষ টাকা তারা এজন্য খরচ করত। সংস্থাগুলি কিন্তু সরাসরি খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গড়া হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্য বর্জনের ব্যাপারে হরেনবাবুর মনোভাব অনমনীয় ছিল। তাঁর মতে, সরকারের পক্ষে কোনরকম সুরাজাতীয় বস্তুর বিক্রীর ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। 1939 সালের গোড়ার দিকে তিনি সরকারী নীতির বিরোধিতা করেন। নোয়াখালিতে 30টি আবগারি শুল্কের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে হরেনবাবু খুসী হন। তিনি বঙ্গ মিতাচার সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। হরেনবাবু বলেছিলেন, 1939 সালে 31 ডিসেম্বর অবধি মাত্র ছ'টা দোকান বন্ধ ছিল, আর বাকি 30টা পূর্ণোদ্যমে 'গাঁজা,

আফিম আর ভাঙ বিক্রী করছিল।' 1887 সালে 10 সেপ্টেম্বর ভারতীয় মিতাচার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1937 সালে 10 সেপ্টেম্বর এই সমিতির পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চাশ বছর ধরে মদ এবং মাদকদ্রব্যের কুফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ফল কিছুই পাওয়া যায়নি। হরেনবাবু যে কোন উপায়ে মাদকদ্রব্য বর্জন চালু করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু 1934 সালে জুলাই মাসে সুরার ওপর কর কমিয়ে দেওয়াতে মদের বিক্রী আরো বেড়ে যায়। এতে হরেনবাবু দারুণ দুঃখ পান। তিনি বলেন: 'মহাশয়, একজন খৃষ্টান হিসেবে আমি এটা পাপ বলে মনে করি। আমার মতে কোন সভ্য সরকার পানীয়ের দাম কমিয়ে গরীবদের বেশী মাত্রায় পান করতে উৎসাহ জোগায় না। বস্তুত পক্ষে, সরকারেরই তো কর্তব্য এদের নিয়ন্ত্রণ আর শাসন করা।' তিনি আরো বলেন, 'এর পরিবর্তে, মৃত্যু-কর চালু করে ঘাট্‌তি মেটানো হোক এবং অন্যান্য জিনিষ, যেমন, পাট আর সূতোর ওপরও কর ধার্য্য করা হোক।'

হরেন্দ্রকুমার দুর্নীতির বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রাম করেন। তা সে যে রকম দুর্নীতিই হোক না কেন। ইংরেজ রাজত্বেও তিনি সাম্প্রদায়িক বৈসাদৃশ্য আর মাদকদ্রব্য বর্জনে নির্ভীক সংগ্রাম করেন। বিদেশী নেতারা ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য বিক্রী বন্ধ করার ব্যাপারে গাফিলতি করতো, হরেনবাবু এই আচরণের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেন।

এই মানুষটি শান্তিপূর্ণ ভাবে শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক আর খৃষ্ট ধর্মের সংশোধন করেন। গান্ধীজীর শিষ্য হরেনবাবু, খাঁটি আর অদম্য ব্যক্তিদের একজন। নিরহংকার আর শান্ত প্রকৃতির হলেও ইনি সেই সময়ের একজন সংস্কারক ও আদর্শবাদী পুরুষ।

Printed at Diamond Lithographers Pvt. Ltd. A-17, Phase-II,
Naraina Industrial Area, New Delhi-110028